গান।

রাগিণী আড়ানা বাহার—যৎ।

হেরি তব সুন্দর মুরতি
তব কিরণ ছটা উজলে
নব বিমল ভাতি
হেরি তব প্রেমজ্যোতি
প্রকাশিছে বিশ্বছবি
তুমি জগতগুরু জগতপিতা
তুমি বিশ্ববিধাতা।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—৺প্রতিভা দেবী।

```
   •            ১            ২          ৩              •
II { মপা নর্সা র্রা। র্মা র্রা র্সা ।। ণা । পা। মজ্ঞা । মা পা I মা জ্ঞা মা।
     হে   •    •    •   •  রি   ত   ব  সু   ন্দ  র   মু   •   •

 ১          ২          ৩                •              ১
।রা । সা ।। ণ্া সা ।। ণ্া সা মা মা I মা মপা মপা। মজ্ঞা মজ্ঞা মা ।।
 র    তি     ত  ব    কি  র  ণ  ছ   টা  উ   •     জ          লে

 ২  •   ৩             •           ১            ২          ৩
।পা ধা ।। ণধা ণা পা । I মজ্ঞা মা পা। মা । জ্ঞা ।। মা রা ।। সা ।।। }I
 ন  ব     •  •   •     বি   ম  ল   ভা    •       •  •     তি

   •              ১             ২            ৩                •
I { র্সা র্না না।  না র্না । ।।  র্সা । র্সা।  র্রনা র্সা র্সা । I  না র্সা ।।
    হে      রি    ত  ব    •   প্রে    ম   জ্যো  •  তি      প্র  কা

 ১            ২           ৩                    •         ১
।র্রা র্মা র্রা ।। র্সা র্সা ।। ণধা ণা পা । } I  { র্রা র্রা ।। র্রা জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা।
 শি  •  ছে       বি  শ্ব     ছ   •  বি           তু  মি      জ  গ  ত  গু

 ২           ৩               •            ১                ২
।র্সা । ।।  র্রা র্সা না না I  র্সা । ।।  ণা পা মা জ্ঞা।  মা পা মজ্ঞা।
 রু          জ  গ  ত  পি    তা          তু মি বি  •     শ্ব বি ধা

 ৩
।মরা । সা । }II
 •    তা
```

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

বাউল—দাদ্‌রা।

ও মন
আপন মনে বন-বিজনে
গা'রে তাঁরই গান
ও তোর
দুঃখ যাবে ব্যথা যাবে
বিপদ যাবে
পাবি পরিত্রাণ।
যদি আসেই আঁধার রাত
যদি বহেই ঝঞ্ঝা-বাত
যদি ঝিলিক মেরে, আকাশ ফেড়ে
হয় গো বজ্রপাত
সে দুর্দ্দিনে হে বন্ধু মোর
কে করিবে ত্রাণ?—
আর কেহ নয়—আর কেহ নয়
দয়াল ভগবান।

যদি সহায় নাহি রয়
যদি বন্ধু বিমুখ হয়
যদি স্বাস্থ্য ও সুখ,—অর্থ ও মান
সবই বিদায় লয়
সে দুর্দ্দিনে আশার আলোক
কে করিবে দান?—
—আর কেহ নয়—আর কেহ নয়
দয়াল ভগবান।
তবে থাকরে ও তুই থাক
ও তাঁর চরণ বুকেই রাখ
সকাল সাঁঝে সকল কাজে
বন্ধুরে ঐ ডাক
ও তোর বিষের জ্বালায় সুধানিষেক
কে করিবে দান?
—আর কেহ নয়—আর কেহ নয়
দয়াল ভগবান॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ ০ ১´ ০ ১´
সা রা -া II { ন্‌া ন্‌া -া। ন্‌া ন্‌া -া I সা -া সা। রা গা -া I ম্গা -া গা।
ও মন্ ০ আ প ন্ ম নে ০ বন্ ০ বি জ নে ০ গা ০ রে

০ ১´ ॥ ০ ০ ১´
। ম্গা -া রা I সা -া -া। (সা রা -া)} I সা সা -া I রা -মা মা।
তাঁ ০ রি গান্ ০ ০ ও ম ন্ ও তো র্ দুঃ ০ খ

০ ১´ ০ ১´ ০
।মা মা -া I পা পধা -ণা। ণা ধা -া I প্ধা পা -া। মা গরা -সা I
যা বে ০ ব্য থা০ ০ যা বে ০ বি পদ্ ০ যা বে০ ০

১´ ০ ১´ ০
I গা গা -া। রা রা -াগ I সা -া -া। সা রা -া II
পা বি ০ প রি ০ ত্রাণ ০ ০ ও ম ন্

০ ১´ ০ ১´ ০
-া সা সা II { রা মা -া। মা মা -পা I পা -া -া। -া মা ণা I
০ য দি আ সে ই আঁ ধা র্ রাত্ ০ ০ ০ য দি
০ য দি স হা য়্ না হি ০ রয় ০ ০ ০ য দি
০ ত বে থা ক্ রে ও তু ই থাক্ ০ ০ ও তাঁ র

১´ ০ ১´ ০ ০
I ণা ণা -া। ধণা -া ধা I পা -া -া। (-া সা সা) } I -া পা পা I
ব হে ই ঝ ন্ ঝা বাত ০ ০ ০ য দি ০ য দি
ব ন্ ধ বি মু খ্ হয় ০ ০ ০ য দি ০ য দি
চ র ণ্ বু কে ই রাখ্ ০ ০ ০ ত বে ০ ০ ০

৬

১´ ॰ ১´ ॰ ১´ ॰
I র্সা র্সা -া। র্সা র্সা -র্রা I ণর্সা ণা -া। ধা পা -া I ণা -া ণা। ধা -ণা ধা I
ঝি লি ক্ মে রে ॰ আ কা শ্ ফে ড়ে ॰ হ য় গো ব ॰ জ্র
স্বা ॰ স্থ্য ও সু খ অ র্থ ॰ ও মা ন্ স ব ই বি দা য়
স কা ল্ সাঁ ঝে ॰ স ক ল কা জে ॰ ব ন্ ধু রে ॰ ঐ

১´ ॰ ১´ ॰ ১´ ॰
I পা -া -া। -পা -া -া I ণা ণা -া। ণা ণা -া I র্সা ণা -া। ধা পা -া I
পাত্ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ সে ছ র্ দি নে ॰ হে ব ন্ ধু মো র্
লয় ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ সে ছ র্ দি নে ॰ আ শার র আ লো ক্
ডাক্ ॰ ॰ ও তো র্ বি ষে র্ আ শা য় সু ধা ॰ নি যে ক্

১´ ॰ ১´ ॰ ১´ ॰
I মা -া মা। গা গা -া I সা -া -া। -া -া -া I ন্া ন্া ন্া। ন্া ন্া ন্া I
কে ॰ ক রি বে ॰ ত্রাণ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ আ র্ কে হ ন য়
কে ॰ ক রি বে ॰ দান্ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰
কে ॰ ক রি বে ॰ দান্ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ॰ ১´ ॰ ১´ ॰
I সা সা সা। রা গা -া I রগা গা -া। রা রা -গা I সা -া -া। সা রা -া II II
আ র কে হ ন য় দ য়া ল্ ভ গ ॰ বা ন্ ॰ ॰ "ও ম ন্"

—॰—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'সরোজিনী'—কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ 'সরোজিনী' নাটক প্রকাশিত করেন। 'সরোজিনী'ও 'পুরুবিক্রমের' ন্যায় বীররসাত্মক ও স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক। উৎসর্গপত্রে গ্রন্থখানি "উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে" সাদরে অর্পিত হয়। নাটকের আখ্যান-ভাগ সংক্ষেপে এই :—

যে সময়ে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করেন সেই সময়ে মহম্মদ আলি নামক এক মুসলমান ভৈরবাচার্য্য নাম ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের ছদ্ম-বেশে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে এবং মেওয়ারের রাণাকে দেবীর প্রত্যাদেশ শুনান :—

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম সম; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোরপুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর! বাপ্পা-বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বংশে আর।

অর্থাৎ দেবীর প্রীত্যর্থে রাণার বারোটি পুত্রকে রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে ও প্রাণাধিক প্রিয়া কুমারী কন্যা সরোজিনীকে দেবীর সমক্ষে বলি দিতে হইবে। রণক্ষেত্রে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের চির আকাঙ্ক্ষিত, সুতরাং রাণা পুত্রগণের জন্য চিন্তিত হইলেন না; কন্যাটিকে কিরূপে বলি দিবেন? কিন্তু রাণা লক্ষ্মণসিংহের সেনাপতি ও মিত্ররাজ রণবীর সিংহ এবং অন্যান্য অনেকেই দেবীর প্রত্যাদেশের কথা অবগত হইয়া নিরপরাধিনী সরোজিনীকে বলি দিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য রাণাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। একদিকে বাৎসল্য ও মমতা, আর একদিকে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য, রাণার

হৃদয়ে দ্বিবিধ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে লাগিল। হৃদয়ের এই ঘাত-প্রতিঘাত গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। অবশেষে স্বদেশের জন্য রাণা কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন কন্যাকে বলি দিবার জন্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে তখন সরোজিনীর ভাবী স্বামী বাদলাধিপতি বিজয় সিং তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। এই মহাপরাক্রান্ত বীর বিজয় সিংহের এবং মেওয়ার-সেনাপতির মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া উভয় পক্ষকে দুর্ব্বল এবং গৃহবিবাদে উন্মত্ত করিয়া চিতোর আক্রমণ করাই মুসলমানগণের উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত ষড়যন্ত্র শেষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, কিন্তু তখন আর উপায় নাই, আলাউদ্দীন চিতোরে প্রবেশ করিয়াছেন। রাজপুত-বীরগণ রণক্ষেত্রে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন, এবং সাধ্বী রাজপুতরমণীগণ অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন। এই নাটকের শেষ ভাগে "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ, দ্বিগুণ" শীর্ষক যে ওজস্বিনী কবিতা আছে তাহা বোধ হয় অনেক পাঠকেরই মুখস্থ আছে। যখন প্রবল পরাক্রান্ত আততায়ীর দ্বারা আচরিত কোনও অন্যায়ের প্রতিকার অসম্ভব মনে হয়, তখন এই কবিতার কিয়দংশ আমাদের স্মৃতিপথে ভাসিয়া আসে এবং আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া অনন্যোপায় হইয়া শত্রুকে ভগবানের ন্যায়দণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া বলি,—

"যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।"

এই কবিতাটী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। সম্প্রতি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে ঐস্থানে একটি বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু পুস্তক মুদ্রণকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঐ স্থলে একটি কবিতা দিলেই ভাল হয়, এবং রবীন্দ্রনাথই প্রাগুল্লিখিত কবিতাটি অত্যল্প সময়ের মধ্যে লিখিয়া দেন।

'পুরুবিক্রমে'র ন্যায় 'সরোজিনী'রও অনেকস্থলে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপনী উক্তি আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বিজয়সিংহের একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"সর্ব্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্যদ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য ত আমরা করি, তারপর যা হ'বার তা হ'বে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কর্ত্তে গেলে, আমাদের পদে পদে ভীত হ'তে হয়। না মহারাজ! ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য ক'র্ত্তে বলচেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য; কিন্তু মহারাজ! কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করে, পৌরুষ আমাদিগকে যেথানে যেতে বল্‌বে,—চলুন আমরা সেইখানেই যাই।"

গ্রন্থের শেষভাগে প্রদত্ত দেশভক্ত রামদাসের মর্ম্ম-স্পর্শিনী আক্ষেপোক্তিটিও উদ্ধারযোগ্য:—

গভীর তিমিরে ঘিরে জল-স্থল সর্ব্ব চরাচর;
চিতাধূম ঘন, ছায় রে গগন,
বিষাদে বিষাদময় চিতোর নগর!
আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ঘোর অন্ধতমসায়;
জয়লক্ষ্মী বাম, ম্লান আর্য্যনাম,
পুণ্য বীর-ভূমি এবে বন্দীশালা হায়!
স্বাধীনতা-রত্ন হারা, অসহায়া, অভাগা জননি!
ধন-মান-যত, পর-হস্ত-গত,
পর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষ-বদ্ধ নিস্তেজ কৃপাণ;
শর তূণাশ্রিত, রণ-বাদ্য হত,
ধূলায় লুটায় এবে বিজয়নিশান।
দেখিব নয়নে কি গো আর সেই সুখের তপন,
ভারতের দগ্ধ ভালে, উদিত হইবে কালে,
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ?
আর কি চিতোর, তোর অভ্রভেদী উন্নত প্রাকার,
শির উচ্চ করি, জয়ধ্বজা ধরি,
স্পরধিবে বীর-দর্পে জগৎ সংসার?
তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন;
হয়ে পদানত, দাসব্রতে রত,
কি সুখে বাঁচিব বল—মরণই জীবন।
জ্বলন্ত দহনে হায় জ্বলিতেছে আজি মন-প্রাণ;
তবে কেন আর, বহি দেহ-ভার,
চিতানলে চিন্তানল করি অবসান!
দেখিয়াছি চিতোরের সৌভাগ্যের উন্নত গগন;
একি রে আবার, একি দশা তার,
স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন!
রঙ্গভূমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার,
না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে,
যবনিকা পড়ে যাক্ জীবনে আমার॥

'সরোজিনী'ও মহাসমারোহে ন্যাশনাল থিয়েটারে

উপর্য্যুপরি অভিনীত হইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংসা লাভ করিল। অমৃতলাল বিজয় সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয়চাতুর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি একখানি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত অতীব কৌতূহলোদ্দীপক একটী প্রবন্ধে * * * সাধারণ নাট্যশালায় 'সরোজিনী'র অভিনয় সম্বন্ধে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা এ স্থলে উদ্ধারযোগ্য :—

"সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জমত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখতেন সেই দর্শকবৃন্দও আত্মহারা হয়ে যেতেন। একদিনকার ঘটনার উল্লেখ করলেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। * * * সরোজিনীকে বলি দেবার জন্যে যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হ'ল, রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে রাজা স্বদেশের কল্যাণকামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রোদন করছেন, উত্তেজিত রণজিৎসিংহ শীঘ্র কাজ শেষ করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্মণবেশধারী ভৈরবাচার্য্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বল্লেন, 'সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর,' অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন! জন-দুই দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই ড্রপ ফেলে দেওয়া হল; তাঁদের ষ্টেজের উপর থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে সকলে শুশ্রূষা করতে লেগে গেল! তাঁরা যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন আবার অভিনয় আরম্ভ হল।"

আর একস্থানে আছে :—

"সরোজিনী নাটকের একটী দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন-চার জায়গায় ধু ধু করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু-তিন হাত উঁচুতে উঠে লক্‌লক্‌ করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের উপর ৪।৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু সরু কাট জেলে দেওয়া হত। * * *

এক এক দল রাজপুত রমণী সেই
জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
দেখ রে যবন দেখ রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে; তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে—তবুও কারু ভ্রূক্ষেপও নেই, তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।"

গ্রন্থকার নাম গোপন রাখিলেও তাঁহার নাম অপ্রকাশিত রহিল না। বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে সুরুচিপূর্ণ, দেশপ্রেমোদ্দীপক নাটকাবলীর সৃষ্টি করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এক নুতন আদর্শের অবতারণা করিলেন। তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। এমন কি পল্লীগ্রামে যাত্রার দলেও সরোজিনী অভিনীত হইতে লাগিল। 'সরোজিনী'র গান সর্ব্বত্র গীত হইতে লাগিল। কলিকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ৺অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয় 'সরোজিনী'র শেষ দৃশ্যের একখানি চিত্র পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা আর্টস্কুল হইতে প্রকাশিত হিন্দুর পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্রের সহিত বিক্রীত এবং গৃহে গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' উপর্য্যুপরি বহুবার মুদ্রিত হইয়াছিল।

অভিভাষণ।

(মহারাজা শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়)

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উত্তরচরিতের সমালোচনা উপলক্ষ্যে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার পরে পঞ্চাশৎবর্ষও অতিবাহিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই কালের মধ্যে তাঁহার গঠিত বঙ্গসাহিত্য অনেক বেশী দূর অগ্রসর হইয়া বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও সাহিত্যিকগণের চিন্তার ধারাকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার সময়কে সন্নিকটে আনিয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ থাকিলে, সে কারণ আমার জানা নাই। তাঁহার সৃষ্ট কুন্দ, কপালিনী, সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, শান্তি ও দেবীরাণী

যদি একালের আর্টের শক্তিকে স্বীকার না করিয়া চির-সৌন্দর্য্যময়ী রূপে আজিও বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তবে কাজ কি একটা বৈদেশিক আদর্শের অপমন্ত্রকে জপ করিয়া?

সংসারে সকলেই অনেক জিনিষ দেখি, অনেক কথা শুনিতে পাই, কিন্তু সকল কথা, সকল পদার্থ কি কাব্য নাটক উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে, না স্থান পাইবার যোগ্য? যোগ্য নয় বলিয়াই সকল জিনিষ সাহিত্যে স্থান লাভ করে নাই। স্থান না দিলে বস্তুতন্ত্রতার অভাব হইবে বলিয়া এক বাধা উপস্থিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলিতে চাহি "যাহা স্বভাবানুযায়ী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি, তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না—কেন না তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ-সংস্পৃষ্ট, পুরাতন ও অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনা মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টি চাতুর্য্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম—তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাবসঙ্গত গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদমাত্র জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিত হয়।"

"কাব্য-শাস্ত্র-বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" এই শ্লোকটি কত কালের কে জানে, কিন্তু কথাটি খাঁটি সত্য। ইহা কেবলমাত্র ভারতের ধীমানদিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে, জগতের সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, বিশেষতঃ বর্ত্তমানের দিনে। অশন-বসনের সংস্থান জন্য আজ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে মেরুদণ্ড-পেষণকারী শ্রম করিতে হয়, তাহার পরে নিতান্ত বাতিকগ্রস্ত ভিন্ন কেহ বেদান্ত বা তদনুরূপ কোন শাস্ত্রচর্চ্চায় মনকে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারে না। সেই জন্য সকলকেই প্রায় উপন্যাস বা ছোট গল্পের সহায়তা অবলম্বন করিয়া আনন্দলাভের প্রয়াস পাইতে হয় এবং বিশ্বসাহিত্যের মন্দিরে গল্পের ও উপন্যাসের এই কারণেই সমধিক সমাদর হইয়াছে। যদি আর্টের খাতিরে সেই উপন্যাস বা গল্প এরূপ হয় যে পিতাপুত্রে একসঙ্গে পাঠ করা অসম্ভব হইয়া উঠে, কিংবা পতি-পত্নীও একত্রে পাঠ বা আলোচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, তবে সে আর্ট সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিলে বা সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান হইলে তাহা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে কি না তাহাও সুধীজনের বিবেচনার বিষয়।

ভারতের নাট্যবিধাতা ভরত, অভিনয়-কৌশলের বর্ণনাকালে বলিয়া গিয়াছেন—

"* * * তথা লজ্জাকরং তু যৎ।

এবম্বিধং ভবেৎ যৎ যৎ তত্তৎ রঙ্গে ন কারয়েৎ।"

কেন এই নিষেধবাক্যের প্রয়োজন হইয়াছিল পরবর্ত্তী অনুশাসনে তাহার উত্তর আছে,—

পিতৃ-পুত্র-স্নুষা-শ্বশ্রূ-দৃশ্যং যস্মাত্তু নাটকম্।

তস্মাদেতানি সর্ব্বাণি বর্জনীয়ানি যত্নতঃ।

মানুষের জীবন-যাত্রার সহিত কাব্য নাটকাদির বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কবি যে চিরসুন্দরের মন্দির রচনা করিতেছেন তাহাদের পাদপীঠের শিলা যদি শ্লথবিন্যস্ত হয়, তবে সে মন্দির কতক্ষণ তাহার উচ্চশির ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখিতে পারিবে? সে মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে যে মন্ত্র উচ্চারিত হইবে তাহা পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী, পতি-পত্নী সকলকেই একত্রে সমাহিত চিত্তে শুনিতে হইবে; সে মন্ত্রের প্রাণ যদি নীতির ও রুচির হোমবারি স্পর্শে পবিত্র না হয়, তাহা হইলে উহা সমাজকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যায়, আর্টের সহস্র দোহাই দিলেও তাহার রক্ষা দুষ্কর। কেবলমাত্র আর্ট নহে, সুন্দর নহে, যাহা সত্য শিব ও সুন্দর তাহাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়াই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ইংরাজ উইলসন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের জয়গান করিয়া বলিয়াছেন যে, পরকীয় প্রেম ভারতবর্ষের হিন্দু নাটকের প্রাণবস্তু নহে; ক্ষণিক আনন্দপ্রদ অসুন্দর বস্তু, প্রাচীন ভারতের কাব্যনাটকে প্রধান স্থান কোন দিনই পায় নাই; এবং ভারতীয়দিগের নাট্যশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইলে প্রতীচীর বহু ক্ষমতাশালী কবি ও নাট্যকারের উৎসাহ ও উদ্যম মন্দীভূত হইয়া যাইত সন্দেহ নাই।

দেশের ইতিহাসে জ্ঞান না জন্মিলে, দেশের প্রাচীন কথা না শুনিলে, পূর্ব্ব পিতামহগণের গৌরবময় কীর্ত্তির কথা না জানিতে পারিলে, আমরা কি ছিলাম, কালবশে আজ কি হইয়াছি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। একদিন ছিল যখন বিদেশীর নিকট হইতে দেশের সম্বন্ধে তিরস্কার বা পুরস্কার যাহাই লাভ করিয়াছি তাহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করতঃ হর্ষামর্ষ যাহাই হউক সে সমস্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছি; তাহার পরে এক সুপ্রভাতে দেখিলাম একটি ক্ষুদ্র তপস্বিসঙ্ঘ দেশের বিলুপ্তপ্রায় পুরাতন গৌরবের অখণ্ডনীয় প্রমাণ সংগ্রহের জন্য

স্বাতন্ত্র্যের পতাকা হস্তে বাহির হইয়া দেশের অরণ্য-কান্তারে, ভূগর্ভে ভূধরে তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন এবং যোগিজনোচিত একাগ্রতা ও নিষ্ঠার বলে যে কঠোর তপোলভ্য ফলকে লাভ করা যায়, তাহারই সন্ধানে গিরিপ্রস্থ, সাগর-সৈকত, বিজন অরণ্য ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর কোন স্থানই তাঁহাদের অগম্য রাখেন নাই। এই বিপুল শ্রমসাধ্য ব্যাপারের ফল তাম্রে, শিলায় ও ইষ্টকে আজ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—আজ কেহ বলিতে পারিবে না যে ভারতবাসী কেবল মিথ্যা পৌরাণিক উপকথা ও কাহিনীর বলে তাহাদের পূর্ব্ব গৌরবের অসত্য গাথা গাহিয়া থাকে। পুরাণের কাহিনী আজ কঠিন শিলায় ও কঠিনতর তাম্রে প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে সমুপস্থিত। আজ বঙ্গের "ধীমান," "বিটপাল" উপন্যাসের কল্পিত ভাস্কর নহে, এবং তাহাদের শ্রীমূর্ত্তিগুলি পুরাণকারের অবিমিশ্র অনৃত কল্পনা নহে।

যে কয়টী তাপস তাঁহাদের জীবনব্যাপী তপস্যায় দেশের পূর্ব্ব গৌরব জগতের সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান করিয়াছেন তাঁহারা আজ তাঁহাদের প্রাপ্য যথাযোগ্য পুরস্কার না পাইলেও উত্তরপুরুষ তাঁহাদের এই বিপুল শ্রমের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র তাপস দলের সংখ্যা সমধিক বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি দেশের সাহিত্যিকবৃন্দের দৃষ্টি আমি সবিনয়ে আকর্ষণ করিতে চাহি। আরও একটি কথা আমার সময়ে সময়ে মনে হয়—বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, কিন্তু দেশে প্রচলিত বহুকালের জনশ্রুতি, কিংবদন্তী ও জনপ্রবাদগুলিও একেবারে পরিহার্য্য নহে। উহাদের মূলে সত্যের অস্তিত্ব না থাকিলে উহাদের জন্মই হইত কিনা সন্দেহ, হইলেও তাহাদের পরমায়ু এত দীর্ঘ হইত না। জনপ্রবাদরূপ বৃক্ষের কাণ্ডে ও শাখায় যে সকল বৃক্ষাদনী ও রাম্না জন্মে তাহা অপসারিত করিয়া মনঃসংযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহার মূলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবার কথা। যুগ-যুগান্ত পরে অবস্থান্তরের মধ্যে যাহাকে আজ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কোন কালেই তাহার সম্ভাবনা ছিল না এমন কথা জোর করিয়া বলাও কঠিন। তাই বলি, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য, দেশের গৌরবময় দিনের সুখপাঠ্য ইতিহাস-গ্রন্থেরও প্রয়োজন হয়ত আছে, এবং সেদিকে আমাদের একটু দৃষ্টিপাতও যেন প্রয়োজন।

সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা হয় নাই, দিন তারিখ সাল লিখিবার অভ্যাস আমাদের পূর্ব্বগতগণের ছিল না, সেইজন্য আজ দেশের ইতিহাস রচনা কঠিন হইয়াছে বলিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিন্দা করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে অবহিত হইতেছি কি না জানি না; বর্ত্তমানে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাদের সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণ বৃত্তান্তসমূহ বর্ত্তমানে দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক প্রভৃতি পত্রিকা হইতে এবং যেখানে যাহা পাওয়া যায় তাহাই আজ দিনে দিনে সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে, পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে কেহ যদি আজিকার দিনের ইতিবৃত্ত লিখিবার প্রয়াস করেন, তাঁহার পক্ষে সে কার্য্য কি কঠিন হইবে, একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে পূর্ব্বপ্রকাশিত অনেক পুস্তক অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে, অনেক সাময়িক পত্রের নাম পর্য্যন্ত আমরা বিস্মৃত হইয়াছি, বহু দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ আজ চাহিলে তাহা একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইবে; কত জনশ্রুতি কিংবদন্তী ইতিপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা প্রাচীন তাঁহাদের দেহান্তরের পরে অনেক জনপ্রবাদ চিরদিনের জন্য বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এইদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া আজ আমরা সচেষ্ট না হইলে ইতিহাসের অনেক মাল-মশলা আমরা চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেলিব সন্দেহ নাই।

বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টী স্ত্রী ঋষিরও অভাব নাই। গৃহ্যসূত্রগুলি হইতে আমরা স্ত্রীশিক্ষার বহু কথা জানিতে পারি, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আজ শুনিতে হইতেছে ভারতীয় নারীগণের শিক্ষার দিকে ভারতীয় পুরুষের দৃষ্টি একেবারেই পতিত হয় না। বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ-যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই বিক্রমপুরেরই অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশের বহু ব্রাহ্মণকন্যা কেবল কাব্য-ব্যাকরণ নহে, দর্শন প্রভৃতি কঠিন শাস্ত্রের শিক্ষাও বালক বিদ্যার্থিগণের সহিত সমভাবে পাইতেন। পিতৃগৃহে এবং পরিণয়ান্তে পণ্ডিত স্বামিগৃহে তাঁহারা পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতিকে বিদ্যালোচনায় বহু সহায়তা দান করিতেন।

জাতীয় ভাবকে অব্যাহত রাখিয়া স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে শিক্ষাদান সকল দেশেই প্রয়োজন, ভারতে সে প্রয়োজন আজ ততোধিক। আমাদের ভবিষ্য জননীগণকে এমনভাবে শিক্ষাদান করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনে সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সহায়তা করিতে পারেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত যেমন আবশ্যক, শিশুশিক্ষার প্রতি মনঃসংযোগও তেমনি প্রয়োজনীয়। শিশু হইতেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সমুদ্ভূত হইবে। আজ যে শিশু, আগামী কল্য সেই জনক ; সুতরাং তাহাদের শিক্ষার দিকে, বর্ত্তমানে যাহারা পিতা তাঁহাদের সযত্ন-দৃষ্টিপাত একান্তই আবশ্যক। শিশুপাঠ্য অনেক গ্রন্থ আজ প্রচারিত হইতেছে, সে সকল গ্রন্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরও অসদ্ভাব নাই, কিন্তু আমার মনে হয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থের ভাণ্ডার আজও আশানুরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই। এমন গ্রন্থ আজ রচিত হইতে হইবে যদ্দারা আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রকার গৌরবের কথা শিশুহৃদয়ে এখন হইতেই মুদ্রিত হইয়া যাইতে পারে, আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণের শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের ছবির রেখাপাত বালক-হৃদয়-ফলকে এখন হইতেই আরম্ভ হইতে পারে।

কিছু দিন হইতে বঙ্গ-ভারতীর মন্দিরদ্বারে কতিপয় মুসলমান সাহিত্যিককে পূজোপকরণ লইয়া উপস্থিত হইতে দেখা যাইতেছে, ইহা আমাদের সাহিত্যের পুষ্টিপক্ষে অতীব শুভ লক্ষণ। আরও আনন্দের কথা যে, সেই সকল সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে আমরা দুই-চারিজন মহিলারও সন্দর্শন লাভ করিতেছি। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা শ্রীরামপুর-নিবাসিনী শ্রীমতী নূরন্নেছা খাতুন এই সম্মিলনে তাঁহার রচিত একটি নিবন্ধ পাঠাইয়াছেন, সমবেত সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে তাহা অবশ্যই পঠিত হইবে। কৃপাপূর্ব্বক তিনি তাঁহার মুদ্রিত প্রবন্ধের একখণ্ড আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য কথাটি পাঠ করিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তিনি কহিয়াছেন, "যদিও আমাদের বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের আদি পুরুষগণ আরব, বাগ্দাদ বা পারস্য হইতে পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই বঙ্গের ফল-জল, আকাশ-বাতাস, ওষধি-বনস্পতি প্রভৃতির সহিত যুগযুগান্ত ধরিয়া আমরা পরিচিত। এই বঙ্গের বাণীই আমাদের জন্মদিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের দিন পর্য্যন্ত নিয়ত কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকারে আমরা বঙ্গমাতারই পুত্র-কন্যা ; কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ে এমন জন অনেক আছেন, যাঁহারা এ পরম সত্যকে অস্বীকার করেন। পঞ্চনদতীরবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেই পাঞ্জাবী, বিহারের সকলেই বিহারী, কিন্তু বঙ্গ-জননীর সন্তান যাঁহারা তাঁহারা কেবলমাত্র ধর্ম্মান্তরের জন্যই বাঙ্গালী নহেন, ইহার ন্যায় আশ্চর্য্য-জনক অযৌক্তিক কথা আর আছে কি না তাহা জানি না।"

আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের জননী জায়া দুহিতা-গণের মনে বঙ্গজননী ও বঙ্গবাণীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি যদি এমনই ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে, তবে তাহা অচিরে কি মঙ্গল ও কল্যাণকে যে আমাদের করায়ত্ত করিয়া দিবে, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গ-বাণীর অভ্রভেদী মণি-মন্দির তাহার তুঙ্গশির উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবে এবং মন্দিরচূড়াস্থ কেতনের চীনাংশুক-শোভা দেশ-দেশান্তরবাসী বিস্মিত-নেত্রে দেখিতে থাকিবে। যে মহীয়সী মোস্‌লেম মহিলার মনে এই মহান্ সত্য স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি বঙ্গদেশবাসী সমাজ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেরই নমস্যা এবং যে হৃদয়ের বলে তিনি এই পরম ও চরম সত্যবাণী উচ্চারণ করিবার সৎ সাহস লাভ করিয়াছেন তাহার নিকটে সকলেরই মস্তক গভীর শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া পড়ে ; আর যে সকল মোসলেম মহিলা পূজার অর্ঘ্য লইয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই এই সমবেত সাহিত্যিক সজ্জন-বৃন্দের নিকট হইতে সাদর অভিনন্দন পাইবার যোগ্য পাত্রী।

আজ যেখানে সাম্বৎসরিক বাণীপূজার মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে, শ্বেতশতদলোপরি সমর্পিতচরণা বীণা-রঞ্জিত-করা বাগ্দেবতার আরাধনার্থ বঙ্গের সজ্জন-সঙ্ঘের হৃদয়-শতদল যেখানে আজ উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছে, আদিশূর বল্লালাদির লীলানিকেতন সেই বিক্রমপুরের শ্রীসম্পদ, গৌরবগরিমা, জ্ঞান-বিদ্যা, শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী, প্রাচীন কাহিনী ; যুগে যুগে ইহার গৌরব, নানাভাবে বর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে আদিশূরের স্থান থাকুক বা নাই থাকুক, তথাপি সমাজে স্বীকৃত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নকারী আদিশূরের গৌরবে বিক্রমপুর গৌরবান্বিত, কৌলিন্যের প্রচলনকর্ত্তা বল্লালের গৌরবে বিক্রমপুর গৌরবান্বিত, বঙ্গের শেষ একচ্ছত্র নরপতি লক্ষ্মণের গৌরবে এই ভূমি গৌরবান্বিত, বিশ্বরূপ, কেশব ও চাঁদ কেদারের অসির দীপ্তালোকের কথা বিক্রমপুরবাসী আজও বিস্মৃত হয় নাই—এ সকল বহু পূর্ব্বের কথা। বর্ত্তমানে জ্ঞান-বিদ্যার চর্চ্চাতেও বিক্রমপুর কেবল বঙ্গে বা ভারতে নহে, সমগ্র ধরণীতলে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র—যাঁহার কীর্ত্তিচন্দ্রমার বিমল রশ্মিপাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের মুখ বহুকাল পরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার জন্ম এই বিক্রমপুরে ; ধ্যানাবস্থিত তদ্গতচিত্ত হইয়া যিনি জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবীর চরণকমলে মন-প্রাণ সমর্পণ করতঃ পরম সত্যের চরমবাণী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় উদাত্তস্বরে জগতের সর্ব্বত্র

ঘোষণা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীপ্রবর ঋষি জগদীশের পুণ্যস্পর্শে এই ভূমি চিরগৌরবান্বিত হইয়াছে। যাঁহার কবিপ্রতিভার হেমরশ্মি-সম্পাতে একদিন প্রাচী-প্রতীচী উজ্জ্বলিত হইয়াছে, যাঁহার দেশমাতৃকার চরণে আত্ম-নিবেদনের দৃশ্যে আজ জগৎ বিমুগ্ধ ও ভারতবাসী ধন্য, সেই ফুল্লসরোজগৌরবা সরোজিনীর অপূর্ব্ব গৌরবে এই বিক্রমপুর গৌরবান্বিত। কালীমোহন, দুর্গামোহন, গুরু-প্রসাদ, অঘোরনাথ, নিশিকান্ত, লালমোহন, মনোমোহন, কালীপ্রসন্ন, রজনীনাথ, চন্দ্রমাধব প্রভৃতি কত মনীষিবৃন্দ এই ভূমিতে জন্মলাভ করতঃ দেশ-দেশান্তরে তাঁহাদের কীর্ত্তিভাতি বিকীরিত করিয়া এই ভূমিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যে বিক্রমপুরের পুত্র-কন্যাগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমস্ত বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, সেই পবিত্র ভূমির অধিবাসিবৃন্দের অনুষ্ঠিত এই বাণী-আরাধনা-ব্রত পূর্ণাঙ্গ হইয়া সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হউক, এই সমাগত সুধীবৃন্দের কায়মনোবাক্যের চেষ্টায় বঙ্গ-সরস্বতীর সিন্দুর-চন্দানাঙ্কিত পাদপীঠ চিরন্তন হইয়া বঙ্গবাসীর সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এই সাহিত্যের সুগম পথে সার্থকতা দান করুক, ইহাই শ্বেত-সরোজ-সমাসীনা বীণাপাণির চরণারবিন্দে কোটি কোটি নমস্কার সহ নিবেদন করিতেছি। —মানসী ও মর্ম্মবাণী।

গ্রন্থ-পরিচয়।

ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা।—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম-বি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সমালোচিতা, ৩৩ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন কলিকাতা হইতে শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভাদুড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। ১৬ পেজী ডবল ক্রাউন আকারে ৩৬+১১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুখবন্ধে "গোধূলির" একটী হাফটোন চিত্র আছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

বাঙ্গালা ভাষার শিশু-পাঠ্য পুস্তকগুলি ছাড়া অপর কোন পুস্তকের যে কিছু মাত্র ব্যাখ্যা ও সমালোচনার প্রয়োজন আছে, পূর্ব্বে তাহা কেহই মনে করিতেন না। কিন্তু প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয় এবিষয়ে আমাদের চিরন্তন ধারণাকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ-কাব্যের অপূর্ব্ব সমালোচনা ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যের এই নূতন বিভাগের প্রথম উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করেন। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানি এক্ষেত্রে তাঁহার দ্বিতীয় চেষ্টার নিদর্শন। এবারে তিনি কবিবর মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য-দুইখানির বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা সহ এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমেই মুখবন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সমালোচনায় রসজ্ঞ সমা-লোচকের লেখনী সম্পাতে সমগ্র কাব্যখানির একটী নিবিড় রসানুভূতি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত এই সমালোচনায় কাব্যরচনার ইতিবৃত্ত ও দুই-একটী নব-নব ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যায়। বিস্তৃত ব্যাখ্যাংশের মধ্যে দুরূহ শব্দগুলির অর্থনির্ণয়, পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রদান ও কবির নিগূঢ় অভিপ্রায়ের রহস্যো-দঘাটন প্রভৃতির মধ্য দিয়া বেশ একটী নবতর ব্যাখ্যা-প্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য আমরা দীননাথ বাবুকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। কারণ বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহা তাঁহারই একান্ত নিজস্ব দান।

কাব্যগ্রন্থগুলির এই জাতীয় সংস্করণপ্রকাশের একটী বিশেষ সার্থকতা আছে; ইহার ফলে জনসাধারণের অন্তঃকরণে কবিপ্রীতি ও কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত হয়। এইজন্য বৈদেশিক সাহিত্যে এই জাতীয় গ্রন্থের কত আদর ও আয়োজন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন ইহার একান্তই অভাব ছিল। আশা করি এবার দীননাথ বাবুর পন্থানুসরণে অনেকে বাঙ্গালা সাহিত্যের এই রিক্ততাকে বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

সন্ধ্যায়—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত; মূল্য ১৷০ পাঁচসিকা। ইহাও একখানি গদ্যপদ্যের গীতি-কাব্য। ইহাতে পাঁচখানি হাফটোন চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল এম. বি. বাহাদুর মহাশয় কৃষ্ণনগর হইতে তাঁহার গত ৬ই ভাদ্র তারিখের পত্রে লিখিতেছেন—

"রাখীভ্রাতঃ! আপনার প্রীতি-উপহার "সন্ধ্যায়"-খানি পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। প্রাতঃসূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আমরা প্রতিদিনই একপ্রকার জন্মগ্রহণ করি। তখন জীবনের উদ্যম, কর্ম্মের উৎসাহ, ও ভবিষ্যতের আশা আমাদিগকে ভবিষ্যন্মুখী করিয়া রাখে। কিন্তু সন্ধ্যায় যখন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি, তখন অতীতমুখী না হয়ে আর উপায় কি? ভবিষ্যৎ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন! গোটা জীবনটা সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা—বাল্যের ও যৌবনের আনন্দ, উদ্যম ও উৎসাহ, আশার প্রদীপ্ত আলোক, কর্ম্মের উদ্দাম প্রবৃত্তি আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভবিষ্যন্মুখী করিয়া রাখে। কিন্তু জীবন-সন্ধ্যা সমাগত হইলে মনের ভাব উল্টাইয়া যায়। তখনও যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার! কাজেই অতীতই আমাদের সেব্য এবং

কতকটা উপভোগ্য হইয়া পড়ে। আমাদের অনেকেরই (বোধ হয়, সকলেরই) জীবন-সন্ধ্যায় অতীত-স্মৃতি প্রচুর পরিমাণে করুণরসসিক্ত হইলেও তাহা তৃপ্তিকর। আপনার এই বার্দ্ধক্যে আপনি জীবন-প্রবাহিনীতে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বমুখী অর্থাৎ অতীতমুখী হইয়া প্রেমবিগলিত হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে ভক্তি ও স্নেহের তর্পণাঞ্জলি দিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের চক্ষু সরস না হইয়াই পারে না। অধিক আর কি লিখিব?"

ব্রাহ্মধর্ম্মের-প্রকৃতি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। মূল্য ১৲ টাকা। ২৩নং চৌরঙ্গি রোড, 'কলিকাতা খৃষ্টিয়ান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি' হইতে খৃষ্টপন্থী শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দত্ত মহাশয় গত ১৮ই ভাদ্রে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সাদরে প্রকাশ করিলাম—

"আমি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহোদয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাইয়াছি। তাঁহার লিখিত পুস্তক-গুলির সমালোচনা করা আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনসদৃশ। আমি "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" নামক পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহাই সাধারণসমীপে প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। আমি অনেক দিন হইতে এইরূপ একটী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় খুঁজিতেছিলাম, আজ সে অভাব ক্ষিতিবাবু আমার পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কেবল যে আমার সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে তাহা নহে, যিনি উক্ত গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহারই সে অভাব পূর্ণ হইবে, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। লেখকমহাশয় যে ভাবে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন কোন ঐশী শক্তি তাঁহাকে পরিচালনা করিয়াছেন, তিনি নিজবুদ্ধিবলে এরূপ গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করেন নাই।

'ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি' যে কি ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা এইখানিতে দেখান হইয়াছে; এবং ইহা আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। আমি প্রার্থনা করি যেন এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক নরনারীর পাঠ্যপুস্তক হয়। বিশেষতঃ যাঁহারা ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা ও চিন্তা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা যেন 'ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি'খানি পাঠ করিয়া দেখেন; ফল কথা ইহা সাধারণের পক্ষে উপাদেয় বস্তু হইয়াছে।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমার প্রাণে খুব ভাল লাগিয়াছে এবং ইহাতে আমার অনেক সন্দেহ ও অভাব নিবারণ হইয়াছে; এবং যে সকল বিষয় বুঝিবার জন্য মনটা এক-একবার অস্থির হইত ও কিছুই স্থির করিতে পারিত না, তাহা এই গ্রন্থ পাঠে তৃপ্ত হইয়াছে; আশা করি বঙ্গদেশ ইহার আদর করিবে। ইহার ভাষা, ভাব, ব্যাখ্যা, যুক্তি, মুদ্রাঙ্কণ, কাগজ ও বাঁধাই সমস্তই উত্তম, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত, মূল্য বার আনা। এখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ-সংগ্রহ; এই অমূল্য উপদেশগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষিতীন্দ্র বাবু সত্যধর্ম্ম-পিপাসুগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া মহর্ষিদেব যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের পরম আদরণীয়, সে কথা আর বলিতে হইবে না। ভারতবর্ষ, ভাদ্র—১৩০২।

প্রভাতী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত; মূল্য বার আনা। ইহা একখানি গদ্যপদ্যের গীতিকাব্য। প্রভাতে উঠিয়া জীবন যেমন কর্ম্মসাধনে অগ্রসর হয়, তেমনি প্রভাতে উঠিয়া চিন্তক্ষেত্রেও নানাবিধ চিন্তা জাগ্রত হইয়া উঠে। শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের চিত্তে প্রভাতে যে সকল ভাব জাগ্রত হয়, তাহারই কয়েকটী তিনি একত্র গ্রথিত করিয়া এই 'প্রভাতী' লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ মনীষী ব্যক্তির নিকটই আশা করা যাইতে পারে। তিনি এই প্রভাতের চিন্তায় অনেক বহুমূল্য কথা বলিয়াছেন। এই ছোট বইখানি সকলেরই সমাদরে পাঠযোগ্য। ভারতবর্ষ, ভাদ্র—১৩০২।

আলোচ্য পুস্তকখানি গদ্য-পদ্যের গীতি-কাব্য। ভক্তের হৃদয়ে বিমল শুভ্র প্রভাতে যে সকল চিন্তা স্বতঃ জাগ্রত হয়—যে সকল উচ্চভাব আসিয়া হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠে, গ্রন্থকার নিজ জীবনের মধ্য দিয়া সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন কষ্ট-কল্পনা নাই—লোকমনো-রঞ্জনকর বিনান বাক্যচ্ছটা নাই; ইহা revealtionএর মত পবিত্র, উপভোগ্য ও একটা অপার্থিব জ্যোতিঃ-মণ্ডিত। আমাদের বড় ভালো লাগিয়াছে।

স্বাস্থ্য-সমাচার, আষাঢ় ১৩০২।

মহর্ষিদেবের ফটোচিত্র।

এবারে আশ্বিনের 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষে' পত্রিকার প্রাপ্য মূল্য সম্পূর্ণ প্রদান করিলে তত্ত্ববোধিনীর নূতন ও পুরাতন গ্রাহকদিগকে প্যাকিং ও রেজেষ্ট্রী খরচা বাবদ মাত্র ।০ চারি আনা লইয়া এক মাসের জন্য মহর্ষিদেবের ফটোচিত্র খানি উপহার দেওয়া হইবে ভ্রমবশতঃ এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। একারণে আমরা বাধ্য হইয়াই উহা স্বীকার করিয়া লইলাম। কর্ম্মাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৮৭ সংখ্যা ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬১। অঞ্জলি—পাপনাশন দেবতা।

১। সুদীর্ঘকাল আমাদের হৃদয়-গগন পাপ-তাপের অন্ধকারে ডুবিয়াছিল। আজ এই বিমল প্রভাতে জ্যোতির জ্যোতি তোমার আগমনে আমাদের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

২। তোমার করুণার পরিচয় আজ আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমাদের কর্ম্মযজ্ঞ সফল হইয়াছে। আমাদের দুঃখদারিদ্র্য ঘুচিয়া গিয়াছে। আমরা শতবিধ পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি।

৩। আমাদের গভীর দুঃখের সময়ে যেমন তোমাকে হৃদয়ে আহ্বান করিয়া আসিয়াছি, আজ সম্পদের সময়েও তেমনি তোমাকে ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছি। তুমি এসো, আমাদের হৃদয়ে আসিয়া বসো। আমরা তোমাকে আমাদের সমস্ত সুখসম্পদ নিবেদন করিয়া দিই।

৪। আমাদের লালনপালন করিবার জন্য তুমিই আমাদিগকে ধনধান্য সুখসম্পদ দাও। আবার তুমিই আমাদিগকে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ করিবার জন্য দুঃখকষ্টও দাও। তুমি সর্ব্বদর্শী—তোমার মঙ্গল দৃষ্টি আমাদের প্রতি অনিমেষভাবে নিপতিত আছে। তুমিই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলদাতা ও উন্নতিবিধাতা।

৫। হে সত্যস্বরূপ! আমাদের অন্তরে তুমি বিমল সত্য প্রকাশিত করিয়া দাও, যাহাতে আমাদের শ্রদ্ধাভক্তিতে, আমাদের জ্ঞানে ও চিন্তায়, আমাদের সকল কর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে একমাত্র তোমারই সত্য কথাসকল সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা ধ্বনিত হয়।

৬। অজ্ঞান প্রভৃতির অন্ধকারে যখন আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন হে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! তোমার সত্যজ্যোতি শত সূর্য্যের জ্যোতিতে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার যেন বিনষ্ট করে।

৭। তুমি সেতুস্বরূপ থাকিয়া ইহলোক ও পরলোক ধারণ করিয়া আছ। আমরা সেতুর এপারে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি সেতুর অর্গল খুলিয়া দাও, যাহাতে আমরা সহজে ওপারে গিয়া তোমার সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া তোমার মঙ্গল আদেশসকল বহন করিতে পারি।

৮। আমরা কর্ম্মসমুদ্রে ডুবিয়া আছি। তোমার আসন কর্ম্মসমুদ্র হইতেও বহু বিস্তীর্ণ। তোমার আসন ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। তুমি আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে এমন বলীয়ান ও তেজঃপূর্ণ কর, যাহাতে আমরা হাসিতে হাসিতে এই সুবিস্তৃত কর্ম্মসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তোমার আসনের কূলে শ্রান্তিক্লান্তি রহিত হইয়া পোঁছিতে পারি।

৯। তুমি তোমার প্রসন্নমূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমাদের উপর তোমার

মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সীমা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তোমার অসীম ভাবের মধ্যে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের ইচ্ছা সফল হউক।

১০। তোমারই আদেশে সূর্য্য প্রভাতে অরুণবেশ ধারণ করিয়া নিত্য উদিত হয়। তোমারই আদেশে তপনের প্রখর তেজ অগ্নির আকারে প্রকাশিত হইয়া নিত্য জগতের মঙ্গল সাধনে নিরত থাকে।

১১। তোমারই আদেশে সূর্য্যের অস্তমিত মহিমা জগতবাসীর অন্তরে জাগ্রত হইয়া প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় জগতবাসীকে তোমার আসনতলে যাইবার পথ প্রদর্শন করে।

১২। সূর্য্যের অস্তমিত মহিমা চন্দ্রমার আকারে তোমারই আদেশে সুনীল গগনে প্রকাশিত হয়। তোমারই আদেশে চন্দ্রমা সুধাবর্ষণে ওষধিসমূহকে সঞ্জীবিত রাখে। তাহারই সাহায্যে আমরাও জীবন ধারণ করিয়া তোমারই নির্দ্দিষ্ট শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।

১৩। হে সুখকর কল্যাণকর দেবতা! তুমি যেমন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অন্তরে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছিলে, তেমনি আমাদেরও অন্তরে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা তোমার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে পারি।

১৪। হে দেবদেব! তুমি সর্ব্বগামী। তুমি একই সময়ে ব্রহ্মাচক্রের অণুপরমাণুতে সমভাবে বিদ্যমান আছ। আজ এই প্রভাততপনের অরুণ কিরণে তোমার প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি। তোমার চরণে অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি স্বতই উত্থিত হইতেছে। তুমি তাহা গ্রহণ কর।

১৫। তুমিই সূর্য্যচন্দ্রের অন্তর্যামী দেবতা। সূর্য্যচন্দ্র তোমাকে জানে না। সূর্য্যচন্দ্রকে তুমিই যথানিয়মে নিয়মিত করিতেছ। আজ তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা—আমাদিগকে অন্নবস্ত্র দিয়া আমাদের শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখ; আমাদিগকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়া আমাদের মনকে উন্নত করিয়া দাও; এবং আমাদিগের আত্মাকে তোমার সহিত প্রেমে ও ধর্ম্মে একযোগে যুক্ত কর। আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন সুখ ও মঙ্গল বিধান কর।

৭০। অঞ্জলি—কর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা।

১। হে কর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর! আমরা সকলে মিলিতভাবে তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কর্ম্মের ফলে আমরা বিবিধ ধনরত্ন লাভ করিতেছি এবং ব্রীহিধান্যপ্রভৃতি লাভ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছি। তুমি সেই সকলের উপর তোমার মঙ্গলপ্রসূ আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

২। তুমি আমাদিগের দেহ মন ও আত্মাকে কায়িক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ পাপ হইতে মুক্ত কর এবং আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে পরিচালিত কর। আমরা সকলে একপ্রাণে সমস্বরে তোমার স্তুতি রচনা করিয়া গান করিতেছি। তুমি তাহা স্নেহসহকারে শ্রবণ কর এবং আমাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন কর।

৩। হে আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের অগ্রণী! তুমি আমাদের এই কর্ম্মযজ্ঞের সহায়স্বরূপে আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিও। কর্ম্মযজ্ঞের পরিণামে তুমি আমাদের গৃহ ধনরত্নে বিভূষিত করিয়া দিও এবং আমাদের ভাণ্ডারসকল ধান্য ও ওষধিতে পরিপূর্ণ করিও।

৪। হে সর্ব্বজ্ঞ মহান্ পুরুষ! তুমি আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন আছ, তেমনি তাহার উপকরণসমূহেও আছ। এই কর্ম্মযজ্ঞের পরিণামে আমাদের যে ফল লাভ হইবে, তাহারও মধ্যে তুমি অবস্থিতি করিবে। আমাদের কর্ম্মের দ্বারা কি প্রকারে কিরূপ মঙ্গল সাধিত হইবে, সে সমস্তই তুমি জানিতেছ। তুমি ফলদাতা। তোমারই হস্তে পরিণাম ফল নির্ভয়ে সমর্পণ করিয়া আমরা কর্ম্ম করিয়া চলিব। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার বিজয়-দুন্দুভি বাজাইয়া আমাদিগকে তুমি সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিও।

৫। হে রক্ষকদিগের রক্ষক! তুমি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে প্রকারে রক্ষা করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলে, হে মঙ্গলবিধাতা! তুমি আমাদিগকেও সেইরূপ রক্ষা করিয়া আমাদের কাম্যবস্তু সকল বিধান কর। তুমিই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমপুরুষ। তুমি আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দাও।

৬। হে প্রভু! অনাথ আমাদের তুমি সহায়

হও। তুমি আমাদের প্রভু, আমরা তোমার চরণের দাস, তোমার একনিষ্ঠ ভক্ত। তুমি আমাদের যোগক্ষেম বহন কর এবং আমাদিগকে তোমার ভক্তের উপযুক্ত ধন-ধান্য হইতে বঞ্চিত করিও না। তুমি আদেশ প্রদান কর, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ হইতে প্রচুর ধনরত্ন বর্ষিত হইয়া আমাদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করুক।

৭। হে সত্যস্বরূপ! তুমি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে স্বপ্রকাশ থাক। প্রভাত-তপনের উদীয়মান মহিমার ভিতরে তুমি যেমন হিরণ্ময় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া আমাদের সম্মুখে সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বারসকল উদ্ঘাটিত করিয়া দাও, সেইরূপ সান্ধ্যতপনের অস্তমিত মহিমার ভিতরেও তুমি তোমার অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া আমাদের সম্মুখে প্রলয়তত্ত্বের দ্বারসকল উদ্ঘাটিত করিয়া দাও।

৮। আমাদের অন্তরে তুমি অস্ফুট বাণীতে বলিয়া দিতেছ যে, কর্ম্মযজ্ঞ তোমার বড়ই প্রিয়। আমরাও তাই তোমার প্রীতিকামনায় সকলে মিলিয়া তোমারই প্রিয়কার্য্যসাধনে যত্নবান হইয়াছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের বংশে তোমার প্রিয়কার্য্যসাধক বর্দ্ধিত হউক; আমাদের বংশে দাতা বর্দ্ধিত হউক। আমাদের বংশের কেহ যেন তোমাকে কখনও পরিত্যাগ না করে।

৯। হে সত্যস্বরূপ! তুমি আমাদিগকে অসত্য হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা কর। আমরা যেন মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা আচার ও মিথ্যা চিন্তা হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকি।

১০। তুমি আমাদের পিতা। আমরা বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমারই শরণাগত হইতেছি। আমাদের গৃহে, আমাদের পরিবারে যেন তোমার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের সমস্ত স্তব স্তুতি, আমাদের সমস্ত গীত গান যেন তোমারই নামে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মসমাজের স্থান।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল এম-এ)

অনেকে প্রশ্ন করেন, ভারতে যে নবজাগরণ হইয়াছে—ইহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের স্থান কোথায়? একদিন ছিল, যখন দেশবাসী ব্রাহ্মসমাজের দিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে তাকাইতেন, ভারতের সমস্ত শুভ আয়োজনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী ছিলেন। এখন কেন ব্রাহ্মসমাজ পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছেন? শুধু তাই নয়, কেহ কেহ মনে করেন, যে আদর্শ এবং যে ভাব ব্রাহ্মসমাজকে সকলের অগ্রবর্ত্তী করিয়াছিল তাহা যেন সমাজের মধ্যে মলিন হইয়া গিয়াছে; ভারতবর্ষ যে আকাঙ্ক্ষা ও আশায় আজ স্পন্দিত, যে ভাবের উদ্বোধনের জন্য ভারত আজ জাগ্রত, তাহা ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের ভিতরের যাঁরা, তাঁরাও বলিতেছেন—'ব্রাহ্মসমাজে দৈন্য এসেছে, অবসাদ এসেছে, ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিক সম্পদে দেউলিয়া হয়েছেন'। এই সমস্ত অভিযোগের আলোচনা করা সহজ নয়, তবে একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, ভারতের বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অতি মৃদু। সমাজকে যে সমস্ত সমস্যা আঘাত করিতেছে সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য কোন ব্রাহ্ম নেতাকে অগ্রবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের মধ্যে আজ কোন্ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত? সকলেই স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ। ভারতবাসী আজ সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ঘুচাইয়া সকলে একভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অগ্রসর; পাপ ও প্রলোভনের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর; অস্পৃশ্য এবং অনাচরণীয় জাতিকে সমান অধিকার দেওয়ার জন্য কৃতসংকল্প; বিবেককে স্বাধীন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই যে জাতীয় ভাবের প্রবল তরঙ্গ—ইহা কি কোন ব্যক্তিগত শক্তির প্রভাবে উদ্বেলিত হইয়াছে? যাঁহারা ভগবানের অনন্তবিধানে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহা কেমন করিয়া বলিবেন? ভগবান আপনি এই মৃত জাতিকে জাগাইবার জন্য কত আয়োজন করিতেছেন। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে শোক-তাপ বিপদ-বিপ্লব মানুষকে আত্মজ্ঞানের পথে লইয়া যায়, তেমনি জাতীয় জীবনসংগ্রামে বিদ্রোহ ও নির্যাতন সকল নানা ভাবে জাতীয় জীবন গঠনে সহায় হয়। ভারতের বর্ত্তমানযুগে এই সামাজিক পরিবর্ত্তনের সময় ব্রাহ্মসমাজের চিন্তার বিষয় অনেক। ব্রাহ্মসমাজ চিরদিনই বিবেকের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, ব্রাহ্মগণ স্বাধীন-

ভাবে ভগবানের পূজা-অর্চ্চনা করিবার জন্য, সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার চিন্তা জাগরিত করিবার জন্য, কত নিগ্রহ-নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন; তাঁহারা পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। সুতরাং ভারতে যে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে ইঁহারা কম আনন্দিত হইতে পারেন না। এই নব ভাব ইহাঁদের চেষ্টার ফলে না হইতে পারে, এবং ইহাঁদের কোনও এক ব্যক্তি বা কোনও এক সম্প্রদায়ের চেষ্টায় হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। নিদ্রিত ভারতে আজ যে জীবনের স্পন্দন তাহা বিধির বিধান। এই জীবন্ত ভাবকে ব্রাহ্মসমাজ যদি গ্রহণ করিতে না পারেন তাহা হইলে লোকে ইহাকে মৃত সমাজ বলিলে আমাদের আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। ইংলণ্ডে যখন Reform Bill এর আন্দোলন হইয়াছিল তখন রামমোহন রায় সেই দেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি এই Reform Bill পাশ না হয় তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবেন। স্বাধীনতার প্রতি এরূপ গভীর শ্রদ্ধা কি ব্রাহ্মসমাজ আজ হারাইয়াছেন? স্বাধীনতালাভ করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে, ভগবানের সহিত নিত্যসম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে। যদি সর্ব্বদা বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, যদি আচারের কঠিন নিগড়ে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, যদি অন্যায় অত্যাচারকে সহ্য করিতে আমরা বাধ্য হই, তাহা হইলে আমাদের আত্মার বিকাশ কি করিয়া হইবে? কি করিয়া আমরা বিধাতার অনন্ত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিব? স্বাধীন যাহারা, তাহারা নীতি ও বিধিকে জ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা করিয়া তাহা আপনাদের কার্য্য পরিচালনের জন্য রক্ষা করে; সেইরূপ নীতি ও বিধি মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়, কারণ তাহা তাহার স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত এবং তাহার বিবেকের অনুমোদিত। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, পরস্পর পরস্পরের কিরূপ বাধ্য। স্বামী সর্ব্বদা স্ত্রীর সুখসম্পাদনে ব্যস্ত— তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না; স্ত্রীও সেইরূপ ভাবে প্রণোদিত। ইহার ভিতরের মূল কথা প্রেম ও ভালবাসা। সেখানে বাধ্যতার নূতন আকার,—এক অপরের বন্ধনের মধ্যে ধরা পড়িতে পাইলেই তাহার মুক্তি। প্রেম বন্ধনকে জীবনের সাধনার বস্তুতে পরিণত করে। যেখানে প্রেম নাই, সেখানে মুক্তি মৃত্যুর পথে লইয়া যায়।

স্বদেশপ্রেমিক দেশরক্ষার জন্য দেশের ইচ্ছার মধ্যে আপনি বাঁধা পড়েন। দেশের ইচ্ছা বিধি ও আচার হইয়া প্রকাশিত হয়। কিন্তু যদি দেখা যায়, কোন বিধি বা কোন আচার দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় প্রাণে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ বিদ্রোহকে বলেন "ঐশ্বরিক অশান্তি।" আমাদের এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে ভারতের এই নবজাগরণ প্রেমপ্রসূত কি না? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে ইহাতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা। আর যদি সত্যই ইহার মধ্যে দেশপ্রীতির নির্ম্মল স্রোত ব্যতীত আর কিছুই না থাকে তাহা হইলে বলিব ইহা ভগবানের মঙ্গলবিধান। অনেক সময় মনে হয়, সকলে কি ভারতের পূর্ণ মূর্ত্তি আপনাদের কল্পনায় ধারণা করিতে পারিয়াছেন? সকলে কি সত্যই মানুষকে আপনার পূর্ণগৌরবে মণ্ডিত দেখিবার জন্য উন্মুখ? হইতে পারে এইরূপ ভাব সকলের মধ্যে নাই। তবে বর্ত্তমান প্রবাহকে যুগপ্রবাহ না বলিবার কারণ আমরা দেখিতেছি না। যদি সত্যই এই নব প্রবাহের পূর্ণগতি মঙ্গলের অনুভূতির মধ্যে না থাকে তাহা হইলে যাঁহারা এই অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য অপর মানুষকে সাহায্য করা।

ভারতের জনপ্রতিনিধিগণ জাতির সহিত জাতির মিলন করিতে চান, অস্পৃশ্যতা দূর করিতে চান, মানুষের মধ্যে মাদকতা ও অন্যান্য প্রলোভনের পথ বন্ধ করিতে চান; ইহা অপেক্ষা আমাদের পক্ষে আর কি শুভসংবাদ হইতে পারে? তবে এই সমস্ত সাধনার পক্ষে মতবিভেদ থাকিতে পারে। জনপ্রতিনিধিরা জাতির সহিত জাতির মিলন করিতে চান রাজনৈতিক সুবিধার খাতিরে। আমরা বলি সমস্ত জাতিকে এক প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিতে, সমস্ত সম্প্রদায়ের বিভেদ ঘুচাইয়া দিতে, কারণ তাহা দ্বারা আমরা ভগবানের পিতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিব, তাহা

দ্বারা মানবের আধ্যাত্মিকতার গভীরতা বৃদ্ধিলাভ করিবে, তাহা দ্বারা আমরা ভগবানকে নিকটে পাইব। ব্রাহ্মসমাজ জন্মগত জাতিভেদ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মসমাজে কেহ অস্পৃশ্য নাই। আমাদের কাছে সকলেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অধিকারী। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার সহযোগী বলিয়া মনে করি। যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের অন্তরায় হয়, তাহা হইলে আমরা এরূপ স্বাধীনতা চাই না। আজ ভারতের সম্মুখে ব্রাহ্মসমাজকে সেই কথা স্পষ্টভাবে বলা দরকার হইয়াছে। রাজনৈতিক সুবিধা আমাদের সর্ব্বস্ব নয়, আমরা চাই মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। মানুষ পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসে পরস্পরের অধীন হইবে; এক অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য নয়, পরস্পরের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য। মনুষ্যসমাজের বন্ধন হবে প্রেম। ব্রাহ্মসমাজের এই কথা যদি ব্রাহ্মসমাজ আজ পরিষ্কার করিয়া সবার কাছে না বলিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অভিযোগের কারণ আছে।

আমরা যদি আপাত সুখের অন্বেষণে মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ভুলে যাই তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের কারণ আর কিছুই হইতে পারে না।

বর্ত্তমান আন্দোলনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভাবিবার অনেক জিনিষ আছে। ব্রাহ্মসমাজ চান সকলের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ, এবং ভগবানের প্রতি প্রীতি। ভারতের লোক কি আজ এই উভয় ভাবে উদ্বুদ্ধ? যদি না হয়, বর্ত্তমান সময় কি এই ভাব উদ্বোধনের বিশেষ অনুকূল নয়? এই অনুকূল প্রসঙ্গ যদি আমরা গ্রহণ না করি তবে আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না।

কত কঠিন সমস্যা সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে, সহস্র সহস্র লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিতেছে, কত নরনারী রোগযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, কত শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, শ্রমজীবিদল ধনীর অর্থলালসার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত। কত লোকে অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কত অসহায়া নারী সংসারের নির্য্যাতনে ক্লিষ্ট। ব্রাহ্মসমাজ কি ইহাদের জন্য ভাবিবেন না? সমাজের এই সমস্ত সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য আমরা কি অগ্রসর হইব না? দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই ব্রাহ্মগণের অনুষ্ঠান আয়োজন দেখিবার জন্য। কোথাও কিছু ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন জায়গায় একটা শূন্য মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই। কোন কোন জায়গায় দু-দশ জন ব্রাহ্ম আছেন নিজের অর্থ অর্জ্জনের জন্য, সমাজের কাজে অগ্রসর হইতে লোক দেখা যায় না। ভারতের পুণ্যতীর্থ কাশীধামে গেলাম, সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লোক আছেন, সকল ভাবে ভগবানের পূজা হইতেছে, কিন্তু নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার কোন বন্দোবস্ত নাই। পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যগণ আপনাদের ত্যাগ ও সেবার নিদর্শনস্বরূপ একটি প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় ও রোগীর শুশ্রূষাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হরিদ্বারে গিয়া দেখিলাম তাঁহাদের সেবার মন্দির, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নাম কেহ জানে না। আর এই বেহারেই বা কি? কত আয়োজন এখানে হইয়াছিল—আজ সব কোথায়! সুনিপুণ কর্ম্মীগণ চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠান পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার লোক নাই। আমরা সকল দেখিয়াও জড়ের মত পড়িয়া আছি। আমরা যদি নরনারীর দুঃখযন্ত্রণাকে নিজের দুঃখযন্ত্রণা বলিয়া না লইতে পারিলাম, যদি সকলের সেবার জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিয়া না উঠিল, তবে আমাদের এই ধন-মান-অর্থে কি হইবে? সুখের অন্বেষণে ঘুরিতেছি—এ সুখ যে দুদিনের। সংসারের মায়ামোহের মধ্যে নিত্য বস্তু লাভ হয় ত্যাগে। সুখান্বেষণে কেবল যন্ত্রণাদি বাড়ে। ব্রাহ্মসমাজকে জাগ্রত করিতে হইলে এই ত্যাগের আবশ্যক। ঈশার রাজত্ব আজ জগতে তাঁহার ত্যাগের জন্য; যে সব নরনারী ত্যাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া লোকসেবা করিতেছেন, তাঁহারা ঈশার ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতেছেন; তাই আজ খৃষ্টসমাজ জীবন্ত সমাজ। যতদিন বুদ্ধের শিষ্যগণ ত্যাগের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন ততদিন, নির্ব্বাণের বাণী এদেশে লোকের কাণে পৌঁছাইয়াছিল। যখনই সুখলিপ্সা সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছে, অমনি দুর্ব্বলতা আসিয়াছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পতন হইয়াছে। পরমহংসের শিষ্যগণ নরনারায়ণের সেবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাই লোকে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। ব্রাহ্মসমাজ যতদিন এইরূপ ত্যাগী লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল ততদিন উহা জীবিত জাগ্রত সমাজ ছিল। লোকে ঐ যে দেবেন্দ্রনাথের ঐ কেশব চন্দ্রের ঐ শিবনাথের কথা শুনিবার জন্য পাগল হইত, তাহার মধ্যে ঐ ত্যাগের মোহিনী শক্তি ছিল বলিয়া। আজ মহাত্মা গান্ধী ভারতের সকল নরনারীর পূজ্য হইয়াছেন তাঁহার ত্যাগের জন্য। এ কি রকম হৃদয় যে সকল নরনারীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য একজন ধনীর সন্তান কৌপীন পরিধান করিয়াছেন, কত দিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইতেছেন! মানুষের সেবার জন্য কোন কাজ তাঁহার কাছে নীচ নয়; হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম—তিনি স্বহস্তে ময়লা পরিষ্কার করিতেছেন। এইরূপ লোকের প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা হবে না ত কি আমাদের প্রতি হবে? আমরা চাই সংসারটাকে নিজের সুখের জন্য করায়ত্ত করিতে—আমরা চাই আমাদের গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী, মোটর; আর গান্ধী ত্যাগ করিয়াছেন নিজের পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্তও। এই দেখেই ত মানুষের মাথা আপনি নীচু হইয়া যায়—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চায় না। ব্রাহ্মসমাজেও ত্যাগের দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়, কিন্তু এরূপ ত্যাগ বড় দেখা যায় না। মানুষের সেবার মধ্যে মানুষের প্রাণ যেমন করে পাওয়া যায় তেমন করে আর কিছুতে পাওয়া যায় না। সেবার মধ্য দিয়া লোকের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করা যায়। যে সমাজে সেবা আছে, যে সমাজে মানবপ্রেমের ধারা প্রবাহিত, যেখানে সহানুভূতি ও প্রেম বিদ্যমান, সেখানে ভগবান আসিয়া নিত্য লীলা করেন; প্রেম না থাকিলে ভগবান দূরে চলিয়া যান। প্রেমময় ভগবানকে আমরা প্রাণ ভরিয়া ডাকি, তিনি আমাদের মৃত প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার করুন। শুধু উচ্চ আদর্শ আছে বলিয়া বসিয়া থাকিলে কি ভগবান আমাদের কৃপা করিবেন? তাঁহার কৃপার স্রোতে আমরা প্রাণমন সমর্পণ করিয়া নিজেরা ধন্য হইব, ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইবে, এবং তাহাতে ভারতও ধন্য হইবে। ব্রাহ্মসমাজের অনেক কাজ আছে। এই নব জাগরণকে জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা মনুষ্যত্ববিকাশের পথে লইতে হইবে, সেই বল ভগবান আমাদিগকে দান করুন।

উড়িষ্যায় আর্য্য-অনার্য্য উপাসনা সংমিশ্রণ।

(রায় মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

অনার্য্য-দেবতা যে কালক্রমে প্রধান আর্য্য-দেবতায় পরিণত হইতে পারেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পুরীর শ্রীমন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এই যে, বসু শবর জগন্নাথের নীলমাধব মূর্ত্তি পূজা করিত। ভক্তের ভগবান্ জগন্নাথ নিত্যই স্বহস্তে বসুপ্রদত্ত ফলমূল সাদরে গ্রহণ করিতেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ জীবন্ত বিষ্ণুর উপাসনা করিবেন বলিয়া, তাঁহার অন্বেষণে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। তিন দিক হইতে দূত অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল। পূর্ব্বদিকে বিদ্যাপতি নামক ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন। তিনিই ফিরিয়া আসিলেন না। তিনি পূর্ব্ব সমুদ্রের কূলে নীলাচলে শবরদিগের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। বসু শবর বলপূর্ব্বক তাঁহাকে কন্যা সমর্পন করিল। ব্রাহ্মণ কিছুদিন শবরপল্লীতে থাকিয়া নীলমাধবের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার অনুনয়-বিনয়ে তুষ্ট হইয়া বসু একদিন তাঁহাকে নীলমাধবের নিকট লইয়া গেল। ব্রাহ্মণকে সেখানে রাখিয়া বসু ফল-মূল সংগ্রহ করিতে চলিল। এই সময় এক কাক বৃক্ষশাখা হইতে নীলমাধবের সন্নিকটস্থ 'রোহিণী কুণ্ডে' পতিত হইয়া দিব্যরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিল। স্থানমাহাত্ম্যে মোক্ষলাভ এইরূপ সহজসাধ্য জানিয়া বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ বৃক্ষারোহণ করিলেন এবং বৃক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিতে যাইতেছেন এমন সময় দৈববাণী হইল—"ব্রাহ্মণ! এরূপ করিও না, সর্ব্বাগ্রে রাজার নিকট নীলমাধবের সংবাদ দাও; পরে যাহা ইচ্ছা করিও।" দৈববাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল এবং তিনি পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া নিরস্ত হইলেন।

যথাসময়ে বসু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল; কিন্তু আজ নীলমাধব তাহার হস্ত হইতে ফলমূল গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন "বহুদিন যাবৎ অরণ্যজাত ফলমূল খাইয়া আমার অরুচি হই-

য়াছে। এক্ষণে পক্কান্ন ও মিষ্টান্ন খাইতে ইচ্ছা করি।” বসু মর্ম্মাহত হইয়া নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং ব্রাহ্মণকে সকল অনর্থের মূল মনে করিয়া তাহাকে বন্ধন করিল, কিন্তু কন্যার কাতর ক্রন্দনে তাহাকে মুক্ত করিতে বাধ্য হইল। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ নীলমাধবের বার্ত্তা লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট গমন করিলেন। রাজা সৈন্য-সামন্ত লইয়া শবরপল্লীতে আগমন করিলেন। বিষ্ণুর সজীব মূর্ত্তি লাভ করিবার আশায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে অহমিকার ছায়া পড়ায় নীলমাধব রাজার মনের ভাব জানিতে পারিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময়ে দৈববাণী হইল—“রাজন্, তুমি আমার দর্শন পাইবে না। তুমি আমার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ কর। তাহার পর পুনরায় আমার সন্ধান করিও।” রাজা বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং নীলমাধবের জন্য নীলাচলে বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তখন যোগে সমাধিস্থ ছিলেন। ব্রহ্মার যোগ সহজ নয়, কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া গেল, নীলাচলের শ্রীমন্দির বালুকায় প্রোথিত হইল।

কালক্রমে মন্দির-সংলগ্ন প্রাসাদ ও বিপণি লুপ্ত হইল, দেশে নূতন রাজা হইলেন। তিনি একদিন শিকারে বহির্গত হইয়া সাগরসৈকত দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছেন, এমন সময়ে অশ্বের ক্ষুর “নীলচক্রে” লাগিল। রাজা বালুকা খনন করিয়া শ্রীমন্দির বাহির করিলেন এবং তাহাকে দখল করিয়া বসিলেন। যথাসময়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ ব্রহ্মার সহিত শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া এই সকল বিপর্য্যয় দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, শ্রীমন্দিরকে নীলাচলের নূতন রাজা নিজের বলিয়া দখল করিতেছেন। উভয় পক্ষের স্বত্বাস্বত্ব নিরূপণ করিবার জন্য ব্রহ্মা এক অতি বৃদ্ধ কাকের উপর বিচারের ভার দিলেন। সে কাক শত শত ব্রহ্মার উৎপত্তি ও লয় দেখিয়াছে, এবং অমরগণের অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী। কাক দেউলটী ইন্দ্রদ্যুম্নের বলিয়া সহজেই নিষ্পত্তি করিয়া দিল। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দিরটি পাইলেন; কিন্তু কোন্ দেবতাকে সেখানে স্থাপন করিবেন? নীলমাধবকে পাইয়াও পাইলেন না, আবার কোথায় বা তাঁহার অনুসন্ধান করিবেন? কিরূপে বিষ্ণুর জীবন্ত মূর্ত্তিকে শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবেন? এইরূপ ভাবনায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সর্ব্বদা বিষণ্ণ মনে অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে লাগিলেন; একদিন স্বপ্নে দেখিলেন বিষ্ণু দারুরূপ ধারণ করিয়া পুরীর ‘আঠার নালার’ নিকট বেলাভূমিতে আসিয়াছেন। রাজা সৈন্য-সামন্ত পাঠাইয়া দারুমূর্ত্তিকে শ্রীমন্দিরে আনাইলেন, এবং কারুকর লাগাইয়া মূর্ত্তিগঠন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন; কিন্তু কার্য্যে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, মিস্ত্রির বাইস ও বাটালি ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। রাজা অগত্যা হতাশ হইয়া নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বিষ্ণু এক বৃদ্ধ মিস্ত্রির বেশে রাজার নিকট আসিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি একুশ দিন একটী রুদ্ধার্গল গৃহের মধ্যে অবস্থান করিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন। ইতিমধ্যে কেহই মন্দিরের দ্বার খুলিতে পাইবে না; যদি কেহ খোলে, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।

রাজা স্বীকার করিলেন। শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু কিছুদিন পরে রাণী ঔৎসুক্যাতিশয় বশে গৃহদ্বার খুলাইলেন, সুতরাং তিনটী শ্রীমূর্ত্তিই অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। এই তিনটী অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিই বলভদ্র, জগন্নাথ ও সুভদ্রা। রাজা রত্নবেদী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার উপর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। জগন্নাথ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “তুমি ইচ্ছামত বর চাও”। রাজা বলিলেন—“যদি আপনি আমার প্রতি প্রকৃতই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন যে, আমার যেন বংশলোপ হয়, কারণ পরবর্ত্তী বংশধরগণ জগন্নাথের দেউল দেখিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিবে, এবং আমার খ্যাতি প্রচার করিবে। ইহা অপেক্ষা আমার নির্ব্বংশ হওয়াই ভাল।” জগন্নাথ “তথাস্তু” বলিয়া বরদান করিলেন। কিন্তু যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশধর ছিল। কৃষ্ণদাসকৃত ‘দেউলতোলা’ নামক প্রাচীন উড়িয়া গ্রন্থে তিন প্রকার সেবকের উল্লেখ আছে—

“যে বন-শবর গোটি বনন্তরে থিলা।
নীল যে মাধবরূপ আন্তর পূজিলা॥
শবর-ঘরে যেঁউ পুত্র হেব জাত।
দৈতা সেবক হেব বোলে জগন্নাথ॥
যেঁউ ব্রাহ্মণ তোহর দূতপণে গলা।
নীলমাধবরূপ ভেট যে পাইলা॥
সে ব্রাহ্মণ ঘরে যেঁউ পুত্র হেব জাত।
প্রকৃত সেবক সে বোইলে জগন্নাথ॥
বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ যে দূতপণে গলা।
শবর-ঝিঅ যে সে প্রদান হোইলা॥
শবরুণী ঠারু যেঁউ পুত্র হেব জাত।
শুদ্ধ সুয়ার সে হেব বোলে জগন্নাথ॥
রোগাগারে সে যে শুদ্ধ সুয়ার হইব।
ভাঙ্গি করি মুগমান রগড়ি দেব॥
তাহা ঘরু অঠা কালি বর্ষরে আসিব।
অনসর ঘরে মোর শ্রীঅঙ্গে লেপিব॥”

এই কয়টি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, বসু নামক শবরের

বংশধরগণ 'দৈতা' শবররূপে কালে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। তাহারা এখনও আপনাদিগকে জগন্নাথ মহাপ্রভুর বংশধর বলিয়া মনে করে। বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার দূত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কুলে যে সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রকৃত সেবক বলিয়া গণ্য হইবেন। বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ যে শবর কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার গর্ভে যে সকল সন্তানাদি জন্ম গ্রহণ করিবে তাহারা 'শুদ্ধ সুয়ার' নামে খ্যাত হইবে। শুদ্ধ সুয়ারগণ পাকশালায় সমস্ত কাজ করিবে। স্নানযাত্রার পর শুদ্ধ সুয়ারগণের গৃহ হইতে শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গলেপ প্রস্তুত হইয়া আসিবে।

'দেউলতোলা' অতিপ্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবকদিগের যে শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়, তাহা হইতে শ্রীক্ষেত্রে আর্য্য ও অনার্য্য উপাসনার সংমিশ্রণ দেখিয়া আমরা আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের সমন্বয়নীতির কিঞ্চিৎ আভাস পাই। এই সমন্বয়নীতি ও সমাজের নিম্ন-স্তরে ক্রমপ্রসারী সোপানাবলীর গুণেই আজিও বহু অনার্য্য বন্য জাতি অলক্ষ্যে প্রতি বৎসরই হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া যাইতেছে। উৎকলের প্রধান প্রধান তীর্থে আর্য্য ও অনার্য্য উপাসনার সমন্বয় আদিম যুগে অনার্য্য প্রভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ; এখনও উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবতার পূজায় আর্য্য ও অনার্য্যগণ যোগদান করিয়া থাকে। কোনও বৃক্ষের নীচে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ডে সিন্দূর লেপন করা হয়। এবং বৎসরে একবার বা গ্রামে যখন মারীভয় হয় তখন সেই সকল গ্রামদেবতার পূজা হইয়া থাকে। এই পূজায় মন্ত্র-তন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিকগণ বলেন—আদিম মানব জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বুঝিতে না পারিয়া লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসনায় প্রথম প্রবৃত্ত হয়। গ্রামদেবতার পূজাকে নিম্নাঙ্গের শক্তিপূজা বলা যাইতে পারে। অনেক স্থলে অনার্য্য পুরোহিত বা ডেহরীগণ এই সকল গ্রাম্য দেবীর পূজা করিয়া থাকে। গ্রামে মারীভয় বা অজন্মার সম্ভাবনা হইলে আর্য্য-অনার্য্য নিম্ন-উচ্চ সকল জাতিই পূজা ও বলি-প্রদান করিয়া গ্রাম-দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। লোকের বিশ্বাস এই যে, গ্রামদেবতা রুষ্ট হইলে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ যোগিনীগণ গ্রামে মহামারী আনয়ন করে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক-একটী গ্রামদেবতার স্থান আছে। ভুবনেশ্বর ও পুরীর ইতিহাস ও কিম্বদন্তী হইতে যাহা জানা যায় তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সুদূর অতীতে এই দুই স্থানে শবর জাতির গ্রামদেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কালক্রমে আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের প্রাধান্য হওয়ায় ক্রমে ক্রমে এই দুই স্থান হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করিবার আর একটী কারণ এই যে, পুরী ও ভুবনেশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি দেখিলে অনার্য্যদিগের গ্রামদেবতার কথাই মনে পড়ে। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাঁহার 'উড়িষ্যা' নামক পুস্তকে জগন্নাথ দেবের পূজাপদ্ধতিতে অনার্য্য উপাসনার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সে সকল কথা এখানে লিখিলে পুঁথী বাড়িয়া যাইবে। নানা কারণে শ্রীক্ষেত্রে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে বলিয়াই সেখানে হিন্দুধর্ম্মের আচারবিচারের কঠোরতা নাই, এইরূপ অনু-মান করা যাইতে পারে। শবরদিগের গ্রামদেবতা যদি পরবর্ত্তী যুগে সত্যসত্যই জগন্নাথ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীক্ষেত্র আর্য্য ও অনার্য্য উভয় উপাসনা-সমন্বয়ের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হুয়েন সাং নামক বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক উড়ি-ষ্যায় আসিয়াছিলেন এবং পুরী বা তখনকার চরিত্রপুরে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় বুদ্ধ-দেবের দন্ত এই স্থানে ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্ত্তি বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের রূপান্তর মাত্র। পরবর্ত্তী যুগে শঙ্করাচার্য্য, কবীর, রামানুজ ও চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল শক্তিশালী প্রচা-রকদিগের প্রচারের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান বোধ হয়, শ্রীক্ষেত্রে অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে। যে সকল ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের আদর্শ শিক্ষার গুণে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, সেই সকল আদর্শ মহাপুরুষের পদরেণুতে পুরীর শ্রীক্ষেত্র পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়াছে। আজ শ্রীক্ষেত্রের নাম স্মরণ করিলে দেশদেশান্তরে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এবং মন-প্রাণ ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া পড়ে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবনস্মৃতি শ্রীক্ষেত্রের ইতিহাসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। শবরজাতির উপাসনা হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের উপাসনা কতদূর পৃথক তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে। অন্য কোন তীর্থে এরূপ হিন্দুধর্ম্মের ক্রমবিকাশের সোপানাবলীর সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায় কিনা তাহা আমরা জানি না। হিন্দুধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সমন্বয়ে পুরীর শ্রীমন্দিরে এক অভিনব উদার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে লৌকিক ব্যবধান যতদূর সম্ভব দূরীকৃত হইয়াছে।

৩১৮ খৃষ্টাব্দে রক্তবাহু নামক এক যবন রাজা বহু সৈন্য-সামন্ত ও নৌবহর লইয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। পুরীর মন্দিরে তালপত্রে লিখিত 'মাদলা পঞ্জিকায়' এই উপাখ্যান উল্লিখিত আছে। পুরীর

মন্দিরের ধনরত্নের কথা শুনিয়া রক্তবাহু পুরী আক্রমণ করেন। দেউলরক্ষকগণ যথাসময়ে বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করায় রক্তবাহুর উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। মাদলা পঞ্জিকার বর্ণনা মতে রক্তবাহু বিফল-মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। মহাসমুদ্র তাহার সৈন্য-সামন্ত গ্রাস করিবার মানসে কিছু দূর সরিয়া গিয়া হঠাৎ প্রবল বাত্যায় উদ্বেলিত হইয়া স্থলাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং রক্তবাহুর সৈন্য-সামন্ত অতল জলে ডুবিয়া যায়। রক্তবাহুর এই বিষয় লইয়া ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বহু তর্ক-বিতর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই গ্রীকদেশীয় সেনাপতি। ইরানদেশীয় পারসিক ও গ্রীকগণকে সে সময় আর্য্যগণ যবন বলিতেন। হাণ্টার সাহেবের প্রধান যুক্তি এই যে, উড়িষ্যার সুন্দর সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি ও চিত্র গ্রীক শিল্পের অনুকরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই হাণ্টার সাহেব কিম্বদন্তীমূলক রক্তবাহুকে গ্রীক সেনাপতি বলিয়াছেন। এ দেশীয় শিল্পকলা, সাহিত্য ও সভ্যতায় যে সকল রত্নসম্ভার আছে, তাহা বিদেশীয় আদর্শে গঠিত, এই ভ্রান্তিমূলক ধারণা ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মনে বহুকাল হইতে বদ্ধমূল রহিয়াছে। প্রবল পরাক্রান্ত মগধ এবং অন্যান্য রাজ্য সকল ভেদ করিয়া গ্রীক সেনাপতি কিরূপে নৌবহর সহ উড়িষ্যার পূর্ব্ব উপকূলে উপস্থিত হইলেন, এই প্রহেলিকার সমাধান করা সহজ নহে। আর এক কথা, মাদলা পঞ্জিকাকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। অনুমান ও কল্পনা দিয়া তাহার ঐতিহাসিক সত্যনিচয় গ্রথিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইস্থলে যবন শব্দ যে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বলা সুকঠিন। মাদলা পঞ্জিকাকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে গেলে অনেক কথাই বিশ্বাস করিতে হয়। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বা অন্য কেহ এই সকল কথা কখনও বিশ্বাস করিবেন না। অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ৩১৮ খৃষ্টাব্দেও পুরীতে জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান ছিল। হুয়েন সাং যখন উৎকলে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীমন্দিরে কি বিগ্রহ ছিল তাহা বলা যায় না। বুদ্ধদেবের দন্ত সে সময় শ্রীমন্দিরে পূজিত হইত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ, শ্রীমন্দিরের তিনটি মূর্ত্তি যে সর্ব্বপ্রথমে গঠিত হয় নাই, তাহার স্থিরতা কি? জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তির অভ্যন্তরে একটার পর একটা কৌটার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা বুদ্ধদেবের দন্ত এইরূপ কোনও অমূল্য পদার্থ আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণের ধারণা। নবকলেবরের সময় সর্ব্বপ্রধান 'পূজাপণ্ডা' চোখে সাত প্রস্থ পুরু কাপড় জড়াইয়া এই অমূল্য পদার্থকে যথারীতি মন্ত্রপাঠ করিয়া স্থানান্তরিত করেন। হুয়েন সাংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও রক্তবাহুর উপাখ্যান হইতে জগন্নাথদেবের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইতেছে। ৺ প্যারীমোহন আচার্য্য মহাশয় তাঁহার উড়িয়া ভাষায় লিখিত ইতিহাসে রক্তবাহুকে তমলুকের নিকটবর্ত্তী কোনও দেশের বৌদ্ধ রাজা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এ অনুমান অনেকটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তমলুক বা তাম্রলিপ্ত সে সময় একটী প্রধান বন্দর ছিল। এই স্থানে বহু বৌদ্ধস্তূপ ছিল। এবং বহু বৌদ্ধ শ্রমণ এই স্থানে বাস করিতেন। তমলুকের আশে পাশে এখনও অনার্য্য প্রভাবের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ এই যে তমলুকের প্রসিদ্ধ দেবী 'বর্গভীমা' এক ধীবরের নিকট সর্ব্বপ্রথমে প্রকট হইয়াছিলেন, বোধ হয় রক্তবাহু নামক ধীবরজাতীয় অনার্য্য রাজা নৌবহর লইয়া পুরী আক্রমণ করিয়া থাকিবেন।

ব্যথার গাথা।

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু)

ব্যথার গাথায় গাঁথব মালা
পরিয়ে দিব গলে,
জমাট বাঁধা বুকের ব্যথা
গল্‌বে আঁখি জলে;

বেদন-ভরা বেহাগ-সুরে
গাইব আপন মনে,
হৃদয়-কোণের গোপন-কথা
কইব তোমার সনে;

বিষাদ-মাখা বাঁশীর তানে
ডাকব তোমার নাম—
ব্যথা আমার জুড়িয়ে যাবে
পুর্‌বে মনস্কাম;

চোখের জলে ধুয়ে যাবে
মনের যত কালো,
ব্যথা-ভরা বুকের মাঝে
জ্বল্‌বে তোমার আলো—
সেইত আমার ভালো;

আমি দিব ব্যথার গাথা
বেদন-ভরা গান—
চরণ-তলে লুটিয়ে দিয়ে
সকল দেহ-প্রাণ,
এইটুকু মোর দান।

সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

মহামতি ভাণ্ডারকরের মৃত্যুতে আমাদের এই ভারতবর্ষ অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এমন এক জন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌কে হারাইল যে, তাঁহার স্থান সহজে পূর্ণ হইবার নহে। মৃত্যুসময়ে তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছিল। সংস্কৃতভাষায় তাঁহার জ্ঞান বিপুলতা লাভ করিয়াছিল, এবং অসামান্য অধ্যয়নফলে তিনি শাস্ত্রের মর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রের বচন কণ্ঠস্থ করিয়া তদুচ্চারণে তিনি তাঁহার অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় দিতেন না। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত অবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহার উপর আর কেহ যে লেখনী সঞ্চালন করিবেন, ভাণ্ডারকর সে পথ রাখিয়া যান নাই। পাশ্চাত্যদেশে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব লইয়া অনেক দিন হইতে ইউরোপীয় মহা পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়া আসিতেছেন, সে ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ডাক্তার ভাণ্ডারকর যে কৃতিত্ব রাখিয়া গেলেন, তাহার যেন তুলনা নাই। তাঁহার খ্যাতি ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও জর্ম্মণ দেশের বিবুধগণের মধ্যে।

তিনি বোম্বায়ের প্রার্থনাসমাজের জনৈক প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; এবং তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক জনসাধারণের সম্মুখে কৃতিত্বের সহিত পশ্চিম ভারতে ধারণ করেন। উক্ত সমাজে তিনি যে সমস্ত সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যান মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় দিতেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলি স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গলাভাষায় অনুবাদ করিয়া এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় চারি-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করেন। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় উপনিষদের ও দেশীয় ভাবের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এইখানে পরলোকগত কেশব বাবুর সহিত তাঁহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি ভারতের অতীতকে শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। অতীতের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হইয়া যায়, ইহা তাঁহার প্রকৃতির বিরোধী ছিল। তিনি মহামতি রাণাডের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ মনে করিতেন। তিনি কেশব বাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন বটে—কিন্তু বাইবেলের উপর কেশব বাবুর অতিরিক্ত আনুগত্য পছন্দ করিতেন না। জষ্টিশ চন্দভার্কার বলিতেন ডাঃ ভাণ্ডারকরের সাধু জীবন তাঁহার অন্তরে যথেষ্ট আনন্দ দান করিত। ভাণ্ডারকর গঠনকার্য্যের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু অকারণ হিন্দু ভাব পরিহারের ভিতর দিয়া সংস্কার কার্য্য সাধিত হয় ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি 'সুবোধ-পত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন। বক্তৃতা দিবার সময় তিনি উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, তুকারাম, নানক ও কবীর হইতে যথেষ্ট শ্লোক উদ্ধৃত করিতেন। তিনি কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং এই উপায়ে তিনি বাহিরের লোককে আকর্ষণ করিতেন।

মহারাষ্ট্রদেশে শ্রদ্ধেয় ভাউদাজি, তেলাং, পণ্ডিত, তিলক, ডাক্তার ভাণ্ডারকরপ্রমুখ অনেকগুলি জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাঁদের নিকট ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেক বিষয়ে যে ঋণী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাঁদের মধ্যে ডাক্তার ভাণ্ডারকর ডাঃ ভাউদাজির পরবর্ত্তী ছিলেন বটে, কিন্তু অপর কয়েকজনের পূর্ব্ববর্ত্তী। "দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস" "বৈষ্ণবধর্ম্ম" "শৈবধর্ম্ম" ও "মালতীমাধবের সংস্করণ" তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির' 'জর্ণলে' তাঁহার অনেক মৌলিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, যাহার জন্য ইউরোপীয়গণ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। অসামান্য তাঁহার প্রতিভা এবং গবেষণা কার্য্যে অসামান্য তাঁহার সহিষ্ণুতা। বিনয়, ঔদার্য্য, সুচরিত্র, দয়া ও মিতাচার তাঁহার স্বভাবের আর একটি দিক। প্রাগুক্ত মহাত্মাগণ ব্যতীত রাণাডে, মোদক, ভাণ্ডারকর, নুলকর, আপ্তে, আগরকর, চিপ্লুন্কর নামধেয় দুই জন, আরও কত মহামতি ঐ অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়া বোম্বাই অঞ্চলকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। আমরা শ্রদ্ধেয় ভাণ্ডারকরের উপদেশ এবং তিলকের গীতা প্রকাশে এবং রাণাডের জীবনচরিত সঙ্কলনে উঁহাদের সহিত যথাসম্ভব যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। বিপুল অধ্যয়নের ভিতরে থাকিয়াও ভাণ্ডারকর প্রার্থনাশীল ছিলেন। পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া যখন তিনি ভগবৎসত্তায় ডুবিয়া যাইতেন তাঁহাকে ঋষি বলিয়া অনুভূত হইত। তিনি দেশপূজ্য তিলকের পিতার বন্ধু ও সমবয়স্ক ছিলেন; তিনি তিলকের সহিত স্নেহের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মহামতি তিলকও তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। ডাঃ ভাণ্ডারকর রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগ না রাখিলেও তিনি উহার সহিত যথেষ্ট সহানুভূতি রক্ষা করিয়া চলিতেন। সমাজের আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী না হইয়াও তিনি আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। তিনি চাহিতেন যে, ধর্ম্মের ভিত্তির উপরেই সংস্কার সাধিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মুখে তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্গের বিদ্যাসাগরের মত ঐ অঞ্চলের বালক ও যুবকগণের জন্য তিনি অনেক-

গুলি সংস্কৃত পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পুণার ডেকান কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ ঐ সময়ে ইউরোপীয়ানগণের নিজস্ব ছিল। জার্ম্মনদেশ হইতে একজন সংস্কৃত অধ্যাপককে আনাইবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় ডাঃ ভাণ্ডারকরকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়। ঐখানেই অবসর গ্রহণ পর্য্যন্ত তিনি স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন। হায়! একে একে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী মনস্বীগণ বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমরা দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছি। জানি না কবে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে!

ডাক্তার ভাণ্ডারকর আপনার অপূর্ব্ব সাধনাবলে এখান হইতে পরলোকের জন্য যথেষ্ট সম্বল আহরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের আত্মার সদ্গতি নিজেই বিধান করিয়া গিয়াছেন। তথাপি সমধর্ম্মী ও সমবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য মঙ্গলদাতার নিকট প্রার্থনা করিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। ঈশ্বর আমাদের আন্তরিক কামনা পূর্ণ করুন।

ভারতের মিলনসাধনে ভাষার ঐক্যের স্থান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই ভারতবর্ষে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্নভাষী অনেক লোক বাস করে। এক ভারতবর্ষে শতবিধ বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তন্মধ্যে কয়েকটী ভাষা সমধিক প্রচলিত বলিয়া প্রধান ভাষারূপে উল্লেখযোগ্য—যথা, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদিগের ব্যবহৃত, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা উত্তরপশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানীদিগের ব্যবহৃত, মহারাষ্ট্রীয় ভাষা মহারাষ্ট্রীয়দিগের ব্যবহৃত, তেলেগু ও তামিল দাক্ষিণাত্যের দুইটী প্রদেশের অধিবাসীদিগের ব্যবহৃত। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয় বলিয়া—সম্পূর্ণ সেই কারণে না হইলেও, অনেকটা সেই কারণে—অনেক সময়ে ইংরাজেরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে বিভিন্ন জাতি (Race) বলিয়া উল্লেখ করেন, যথা—বাঙ্গালী জাতি (Bengalee Race), মহারাষ্ট্রীয় জাতি (Marhatta Race) ইত্যাদি। এই সূত্র ধরিয়া ইংরাজদের অধিকাংশই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, এই সকল বিভিন্ন প্রাদেশিক জাতি সকল বিষয়ে এতই বিভিন্ন যে, ইহাদিগকে লইয়া সমগ্র ভারতের একটা রাষ্ট্রীয় জাতি দাঁড় করাইতে পারা যায় না।

এই সিদ্ধান্ত ঠিক হউক আর নাই হউক, ইংরাজদিগের মুখে বাল্যকাল অবধি সময়ে অসময়ে এই সিদ্ধান্ত শুনিতে শুনিতে আমরাও পরস্পরকে সত্যসত্যই এতদিন পৃথক জাতি বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছিলাম, এবং বলিতে কি, আহারে বিহারে, স্বপনে জাগরণে ইংরাজদিগের ঐ গুরুমন্ত্র জপ করিতে করিতে সত্য সত্যই আমরা পৃথক পৃথক জাতি হইয়া পড়িতেছিলাম। আমাদের উপর একটা জাতিগত পার্থক্যের (racial distinction) মসীবর্ণ কালো অন্ধকারের ছায়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। লর্ড মেকলে বাঙ্গালীদিগকে মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিয়া নিজেরই যে হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। অনেকে বলেন যে, ভাষার খাতিরে, অলঙ্কারের টানে তিনি এইপ্রকার লিখিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস যে, অন্তরে তাঁহার বাঙ্গালীবিদ্বেষ মুদ্রিত না থাকিলে তিনি সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এভাবে মসীলিপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন না। যাই হউক, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অনুকরণে ও অনুসরণে মার্শম্যান প্রভৃতি ঐতিহাসিক নামের কলঙ্কস্বরূপ ইংরাজেরা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই আমরা আমাদের বাল্যকাল অবধি ঘরে বাহিরে, গৃহে বিদ্যালয়ে, সর্ব্বত্র বংশপরম্পরায় মুখস্থ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা তো জানা কথা যে আত্মপ্রেরণার (Auto-suggestion) বলে সুস্থ ব্যক্তিও আপনাকে রোগী ভাবিতে ভাবিতে রোগী হইয়া পড়ে এবং রোগী ব্যক্তিও অনেক সময়ে আপনাকে রোগমুক্ত করিতে পারে। আমরাও সেইরূপ ভুল ইতিহাসের কথা মুখস্থ করিতে করিতে সত্যসত্যই আপনাদিগকে বহুকাল যাবৎ ঐ সকল গুণের (?) কালিমামণ্ডিত আধার মনে করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি নাই। ইংরাজেরা তো জানিতেন যে মোহনলাল প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালী বীর তাঁহাদের প্রভু নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্য অতুলনীয় সাহস প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপাত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। তবু যে মেকলে প্রভৃতি লেখকের রচিত গ্রন্থসকল অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল আমাদের গলাধঃকরণ করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইহাতে উহার কারণ সম্বন্ধে এই সন্দেহ স্বতঃই জাগ্রত হয় যে, বাঙ্গালীরা ঐ সকল ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন দারিদ্র্যে পূর্ণ করিয়া তুলিবে এবং চিরদাসখতে স্বাক্ষর করিয়া পদানত হইয়াই থাকিবে।

শুভক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ একদিকে বঙ্গবাসীর মনুষ্যত্বের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে ভক্তিভাজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতির ন্যায় ঐতিহাসিক বীরগণ

বহু অনুসন্ধানের ফলে ঘোষণা করিলেন যে, মেকলে, মার্শম্যান প্রভৃতির কথা মিথ্যা কথা, তাঁহাদের গ্রন্থ ইতিহাস নামের কলঙ্ক—ইতিহাসের নামে রাশি রাশি মিথ্যা কথায় পরিপূর্ণ। ইতিহাসের দিক হইতে ইহার প্রমাণ পাইয়া আমাদের হৃদয় হইতে দীনতার পাষাণ-ভার নামিয়া গেল। আমরা বুঝিলাম যে আমরা সত্য-সত্যই হেয় নই; আমরা বুঝিলাম যে আমরা সত্যসত্যই বধ্যভূমিতে পরিচালিত হইবার উপযুক্ত মেষ নই; মনুষ্য চালাইবার উপযুক্ত বীর—মানুষ।

এই সত্যকে সুস্পষ্টরূপে সমর্থন করিবার জন্যই যেন ভগবান ইউরোপীয় মহাসমর প্রেরণ করিলেন। সেই সময়ে যখন লোকের অভাব হইল, তখন কে সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছাব্রত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে সমুদ্যত হইল?—বাঙ্গালী। চন্দননগরে স্বেচ্ছাব্রত বঙ্গসেনার সর্ব্বপ্রথম কেন্দ্র সংগঠিত হইল। গুজব উঠিয়াছিল, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না যে, ইংরাজ রাজপুরুষেরা ফরাশি গবর্ণমেণ্টের নিকট বঙ্গসেনা সংগঠনের বিরুদ্ধে নানাবিধ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। আপত্তি তুলুন আর নাই তুলুন, তখন ফরাসি গবর্ণমেণ্টের প্রাণের দায়—তাঁহারা কোন ওজর-আপত্তিই শুনিতে পারিলেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের এমন সুন্দর অবসর ছাড়িবেন কেন? তাঁহাদেরও তো যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় লোকের যথেষ্টই অভাব ছিল। তাঁহারাও তখন উৎসাহের সঙ্গে বঙ্গসেনা সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন। ফলে, তাঁহারা যুদ্ধে বঙ্গবীরগণের অপ্রত্যাশিত সাহস, বীরত্ব, ক্ষমতা, সংযম ও ধৈর্য্য এবং মৃত্যুর সম্মুখে নির্ভীকতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কিন্তু—যুদ্ধও গেল—বলিতে গেলে বঙ্গসেনাও উঠিয়া গেল। বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি এবং গবর্ণমেণ্টের নিজের উপকার—গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন না। যাক্, সে কথা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে!

আমরা এখানে এইটুকু বলিতে চাই যে, এতদিন বঙ্গবাসীর সেনাদলে ভুক্ত হইবার অধিকার না থাকায়, তাহারা মেকলে প্রভৃতির অঙ্কিত কলঙ্ককালিমা ঘুচাইবার অবসর পায় নাই। এবং সেই কারণে, কেবল ইংরাজেরা নহে, কেবল অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি নহে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীগণও বঙ্গবাসীকে কাপুরুষ, ভীরু প্রভৃতি হেয়দৃষ্টিতে দেখিত। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আমাদের বাল্যকালে শিখ প্রভৃতি বীরজাতীয় কাহারও পার্শ্বে কোন বাঙ্গালী দাঁড়াইলে সে বাঙ্গালীকে "লাঙ্গাশির" অর্থাৎ নগ্নশির বা উষ্ণীষবিহীন বলিয়া উপেক্ষাদৃষ্টিতে দেখিত। "লাঙ্গাশির" বা উষ্ণীষবিহীন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সকল বীরজাতীয় (Martial Race) লোকই উষ্ণীষ ব্যবহার করে, কেবল ভীরু, কাপুরুষ, পলায়নতৎপর বাঙ্গালীই উষ্ণীষ ব্যবহার করে না, ইহাই তাহাদের ধারণা। আমরা বাল্যকালে দেখিতাম যে, অন্যান্য জাতির লোক বাঙ্গালীকে দেখিলে যেন স্বভাবতই মনে করিত—"আমরা যোদ্ধৃজাতির বংশধর, আর তোমরা ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দারের বংশধর"; বাঙ্গালীরাও মিথ্যা ইতিহাসে লিখিত কলঙ্কজনিত দীনতার পাষাণভারে অবনতহৃদয়ে সত্যসত্যই মনে করিত যে, "আমরা ভীরু কাপুরুষ জাতি, তোমরা বলদৃপ্ত যোদ্ধৃ-জাতি।" এইভাবে ভাবিত হইয়া বাঙ্গালী অন্যের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যাইত। কিন্তু আজ বঙ্গসেনা ইউরোপীয় মহাসমরে অনুপম সাহস, বীরত্ব ও সামরিক কলাকৌশল-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া সেই প্রাদেশিক পার্থক্য ঘুচাইবার পথে বাঙ্গালীকে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। আজ শিখ, গুর্খা, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী যোদ্ধা, অযোদ্ধা সকল জাতিরই সঙ্গে বাঙ্গালী সমান তেজে দাঁড়াইতে পারে, বীরত্বের গৌরব করিতে পারে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ইউরোপীয় মহাসমরের পরেই ভারতবাসী প্রকৃত ঐক্যের পথে চলিয়াছে বলিতে পারি। আর কিছুকাল যুদ্ধ স্থায়ী হইলে ভারতবাসী মিলিত হইয়া যে এক হইয়া যাইত, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে সকল বিষয় বিভিন্ন জাতির বা বিভিন্ন মানবের ঐক্যসাধনে সহায়তা করে, তন্মধ্যে, বোধ হয়, ইহা অস্বীকৃত হইবে না যে, মহাসমরের ন্যায় ভাষার ঐক্যও একটী বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করে। এখন তো আর যুদ্ধ নাই—যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই গবর্ণমেণ্টের চক্ষে বঙ্গসেনার আর প্রয়োজন নাই—বঙ্গসেনার তিরোভাবও ঘটিয়াছে; যাহা আছে, তাহা উপহাসের যোগ্য, বঙ্গসেনার ছায়ামাত্র। আমরা বারংবার বলিব যে, বঙ্গসেনা সংগঠিত ও সংবর্দ্ধিত হইতে থাকিলে অন্য যে কোন উপকার সাধিত হউক না কেন, দেশ অচিরে মর্ম্মগত ঐক্যের পথে নিঃসন্দেহ অগ্রসর হইত।

এই ঐক্যসাধনের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ হইত ভাষার ঐক্যসাধন। যুদ্ধ চলিতে থাকিলেই বঙ্গসেনা অন্যান্য প্রাদেশিক সৈন্যমণ্ডলীর সঙ্গে যে মিশিতে বাধ্য হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কাজেই বাধ্য হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই সর্ব্বদেশপ্রচলিত একই ভাষায় পরিণত হইত। যুদ্ধস্থলে মৃত্যুর সম্মুখে যেরূপ বন্ধুতা হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। বঙ্গসেনা ভালরূপ সংগঠিত হইলে তাহাদিগকে

যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার ফলে অন্যান্য প্রাদেশিক সেনার সহিত যখন বঙ্গসেনার সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইত, তখন তাহাদের মধ্য হইতে ভাষার পার্থক্য সহজেই খসিয়া যাইত এবং তৎপরিবর্ত্তে একটী সর্ব্বপ্রদেশের উপযোগী ভাষা সমগ্র দেশে প্রচলিত হইত। উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রই মূলে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণোদ্ভূত এই নবতর সরল ভাষার জন্মস্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার বর্ণলিপির আকার ভারতবহির্ভূত দেশের বর্ণলিপির আকার অনুসরণ করিয়াছে; তদানীন্তন মুসলমান নবাবদিগের প্রভাবে উহা আরবী ও ফারশী বর্ণলিপির নকলে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে, সেই কারণেই উহা সর্ব্বপ্রদেশে সাধারণ ভাষারূপে পরিগৃহীত হইতে পারে নাই। ইংরাজেরা সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষাকে ইংরাজী বর্ণলিপি দ্বারা ব্যক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া যেরূপ স্বায়ত্ত করিয়া লইয়াছে, সেইরূপ উর্দ্দু ভাষাকে দেবনাগরী বর্ণলিপির দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলে উহাই, সম্ভবতঃ, ভারতের সর্ব্বসাধারণ ভাষারূপে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। ইহা ভারতের সাধারণ ভাষা দাঁড়াইলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর পরস্পরকে বুঝিবার ও বুঝাইবার পক্ষে বর্ত্তমানে ভাষার পার্থক্যরূপ যে এক মহান্ বাধা আছে, তাহা সহজেই অপসারিত হইতে পারে।

ভাষার পার্থক্য যে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার কি অমোঘ অস্ত্র, সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী লর্ড কার্জ্জন তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ যখন দুই বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত হইল, অমনি তাড়াতাড়ি নাকি বিদ্যালয়ের সহকারী পরিদর্শকদের (Deputy Inspector of Schools) প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতিতে শিশুদের প্রথমপাঠ্য বর্ণপরিচয় রচনা করিবার আদেশ হইয়াছিল। এইরূপ বর্ণপরিচয়ের একখানি 'খসড়া' মন্তব্য প্রকাশের জন্য আমার পরলোকগত বন্ধু অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম-এ মহোদয়কে দেওয়া হইয়াছিল; তিনি আবার সে সম্বন্ধে আমার মন্তব্য চাহিলেন। আমার মন্তব্য দিলাম এই যে, তিনি যেন গ্রন্থপ্রণেতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পয়সার লোভে তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে "হালাল" করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? পুস্তকখানি উপরিতন কর্ম্মচারীদিগের ইঙ্গিত অনুসারে আসামী-চট্টগ্রামী-ঢাকাই-মুসলমানী বাঙ্গালায় এরূপ একটা জগাখিচুড়ির উপর রচিত হইয়াছিল যে, সে ভাষা কোন বাঙ্গালীর পক্ষে বুঝা অসম্ভব হইত। ফলে দাঁড়াইত এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া যাইত ও পরস্পরের চির-বিচ্ছেদ ঘটিত। সুখের বিষয় এই কিম্ভূত-কিমাকার ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই ভগবৎকৃপায় বঙ্গবিভাগ উঠিয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

ভাষার ঐক্য যে পরস্পরের মিলনসাধনের, পরস্পরকে বুঝিবার ও বুঝাইবার কি মহদুপায় ও সদুপায়, তাহা সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী মহোদয়দ্বয়—ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এবং মহাত্মা গান্ধি—স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সারদা বাবু সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষায় দেবনাগরী বর্ণলিপি প্রবর্ত্তনের দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। ভাষার ঐক্যসাধনের পূর্ব্বে বর্ণলিপির ঐক্যসাধন কতদূর সম্ভব, তাহা সারদা বাবুর পরলোকগমনের কারণে পরীক্ষিত হইতে পারিল না। উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, ভাষা ও বর্ণলিপির গঠন একসঙ্গে হইলেই তাহা স্থায়িত্ব লাভ করে। মহাত্মা গান্ধি ভারতবাসীর ঐক্যসাধনে ভাষার ঐক্যের বিশেষ উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াই হিন্দীভাষাকে সুতরাং দেবনাগরী বর্ণলিপিকেই ভারতের সর্ব্বসাধারণের ভাষা ও বর্ণলিপি করিবার জন্য উপদেশ ও অনুরোধ করিয়াছেন।

ভাষা ও বর্ণলিপিতে বিভিন্নতা থাকিলে পরস্পরের মনের ভাবপ্রকাশে যে বড়ই বাধা জন্মে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সমগ্র ভারতের শিক্ষিতদের মধ্যে, বলিতে গেলে, ইংরাজী ভাষা একপ্রকার সাধারণ ভাষা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাই জাতীয় মহাসভা, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনা, সমগ্র ভারতের উপযোগী সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক আন্দোলন-আলোচনা সম্ভবপর হইয়াছে। একবার মনশ্চক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল ইংরাজী সংবাদপত্র সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া পঠিত হইতেছে, এবং সেই সকল পত্রের যে সকল মন্তব্য ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোচিত হইতেছে, ইংরাজী ভাষা পরিত্যাগ করিলে সে সকল সংবাদপত্রই বা থাকে কোথায় এবং সেই সকল মন্তব্যই বা আলোচিত হয় কি প্রকারে? ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজী ভাষার উপযোগিতা আলোচনা করিলেই আমরা সমগ্র ভারতের জন্য এক ভাষা ও এক বর্ণলিপির একান্ত প্রয়োজন স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিব। সমগ্র ভারতের জন্য এক ভাষা ও এক বর্ণলিপি প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতবাসীরও যেমন উপকার হয়, গবর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ মঙ্গল সাধিত হয়—কর্ম্মচারীদিগকে এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে সহজেই স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে; এখনকার মত কর্ম্মচারীদিগকে Imperial Provincial শ্রেণীতে

বিভক্ত না করিলেও করা যাইতে পারে, অন্ততঃ প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হয়, সে টাকাটা বাঁচিয়া যায়। কিন্তু আমরা বলিতে পারি না, ভেদনীতির উপর যে গবর্ণমেণ্ট ভাবেন যে তাঁহাদের ভিত্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, সে গবর্ণমেণ্ট এক ভাষা ও এক বর্ণলিপি প্রবর্ত্তনের পক্ষে সহায়তা করিবেন কি না। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে সহায়তা না করিলেও আমাদের এবিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশে হিন্দী হউক বা অন্য যে কোন ভাষা হউক, সমস্ত ভারতবর্ষে যে একই ভাষা ও একই বর্ণলিপি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, ইহা দেশের পক্ষে নিশ্চতই সুলক্ষণ বলিতে হইবে। আজ প্রায় এগারো বৎসর হইল আমরা এই বিষয়ে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় আলোচনা করিয়া সমগ্র ভারতের জন্য একই ভাষা ও একই বর্ণলিপি প্রবর্ত্তনের উপকারিতার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। সেই আলোচনাসূত্রে আমরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও বিজ্ঞান-মহারথীদিগকে লইয়া একটী সভা আহ্বানের ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। আমাদের মনে হয় যে, ভারতের অন্তর্গত যে সকল প্রদেশে বিভিন্ন মুখ্য ভাষা বা বর্ণলিপি প্রচলিত আছে, সেই সকল প্রদেশের সাহিত্য ও বিজ্ঞান-মহারথীদিগকে লইয়া একটী সভা করিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে নির্ব্বাচিত করিয়া একটী স্থায়ী সমিতি গঠন করিলে ভাল হয়। দেশ ও জাতি-নিরপেক্ষভাবে সেই সমিতি আলোচনা করিয়া দেখিবেন যে, কোন্ ভাষা ও বর্ণলিপি বৈজ্ঞানিকভাবে গড়িয়া উঠিবার ফলে এবং বিস্তৃতি, গভীরতা, তেজস্বিতা ও প্রকাশসুগমতার কারণে সমগ্র দেশে প্রচলিত হইবার উপযোগী। সেই সমিতির আলোচনার ফলাফল সমুদয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে সবিস্তার আলোচনার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। তাহার পর, সেই সকল সমালোচনার সহিত সমিতির আলোচনার ফলাফলগুলি সমগ্র ভারতের সাহিত্যিকগণের একটী সাধারণ সভায় আলোচিত হইয়া যাহা স্থির হইবে, সমগ্র ভারতবাসীকে তাহাই অবনত মস্তকে শিরোধার্য্য করিতে হইবে। কোন বিশেষ ভাষার কয়েকজন পক্ষপাতী লোকের সভা করিয়া বলপূর্ব্বক ভারতের সকল প্রদেশকে যে সেই ভাষা স্বীকার করাইতে পারা যাইবে, সে আশা সুদূরপরাহত। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী, "হিন্দু পেট্রিয়টে" এই বিষয়ে একটী সুন্দর আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লেখক, বলিতে গেলে, আমাদেরই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতের যে ভাষা যত শক্তিমত্তা দেখাইতে পারিবে, সেই ভাষাই ভারতের সর্ব্বসাধারণ ভাষারূপে গৃহীত হওয়া অধিকতর সম্ভব। হয় তো এমনও হইতে পারে যে, একটী সর্ব্বসাধারণ ভাষার সঙ্গে আরও পাঁচটী প্রাদেশিক ভাষাও প্রচলিত থাকিবে, যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী ভাষা বলিতে গেলে ইউরোপের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও প্রত্যেক দেশেরও পৃথক পৃথক ভাষা আপনার পথে অগ্রসর হইতেছিল।

প্রকৃত কথা বলিতে কি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এমন দিন আসিবেই, যে দিন ভারতের এক ভাষা ও এক বর্ণলিপি না হইয়া থাকিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে ভারতে যে সর্ব্বাঙ্গীন বৃহৎ জাগরণ দেখা দিয়াছে, যে ভাষা শক্তিতে, প্রাণেতে, ভারতবাসীর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সকল দিক হইতে সেই জাগরণের সহায় হইবে, সেই ভাষাই ভারতের সর্ব্বসাধারণের ভাষা দাঁড়াইবে; এবং সেই ভাষাই ভারতবাসীকে অচিরে মিলনের পথে সহস্রপদ অগ্রসর করিয়া দিবে।*

* 'সেবক'—আশ্বিন, ১৩৩২ হইতে উদ্ধৃত।

শরতের গান।

ললিত—চৌতাল।

হের শরৎ এল বঙ্গে!
কিবা শোভা নীলাকাশে
ফুল হাসে—
স্নিগ্ধ-শীতল সমীর বহে অঙ্গে!
একি শুভ্র রৌদ্র-রেখা
তৃণে আলপনা আঁকে—
বকুল চামেলী শেফালিকা মিলি'
সাজায় ডালি কি রঙ্গে!

একি পদ্ম-ঘেরা সরোবর
একি কুমুদিনী মনোহর
একি কূল-ভরা জল নদী টলমল
ধায় মৃদু-তরঙ্গে!
একি লক্ষ পাখীর গীতি
তরু-মর্ম্মর বায় নিতি
ঢেউ খেলে যায় সোনার ক্ষেতে
দুলায়ে মৃদুল ভঙ্গে!

একি শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না
শশী তরল রৌপ্য ঢালে—
একি অগণন তারকা-রতন
জল জল নভ-থালে!
গৃহে গৃহে বাজে বাঁশী
ওঠে আনন্দ-হাসি
একি মধুরিমা লাবণ্যে
হের শরৎ এল বঙ্গে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা সা I সা ঋা। -মা -া। মা মা। মগা -পা। মা -গা। -ঋা -সা I
হে র • শ র • ৎ এ ল ব ঙ্ গে • • •

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
I সা ঋা। -মা -া। মা মা। মগা -পা। মা -া। পা পা [দা -র্সা।
শ র • ৎ এ ল ব• ঙ্ গে • কি বা শো •

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। র্সা -া। র্সা র্সা। র্সা -া। র্ঋা -না। না না I নদা -া। পা -া।
ভা • নী লা কা • শে • ফু ল হা • সে •

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -া -া। সা -দা। দা দা। পা দা I পা পা। -দা -পা। দা পা।
• • স্নি গ্ ধ শী ত ল স মী • র্ ব হে

০ ৩ ৪
। মগা -পা। মা -া। মা মা II
অ• ঙ্ গে • 'হে র'

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা পা II মা -দা। দা না। -া র্সা। র্ঋা -া। -র্সনা র্সা। -া -া I
এ কি ও • ভ্র রো • ভ্র রে • •• থা • •

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
I র্ঋা র্ঋা। র্ঋা -র্সা। র্সা র্সা। না -া। র্সা -না। -দা -পা I দা র্সা।
তু লে আ ল্ প না আঁ • কে • • • ব কু

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। র্সা র্সা। র্সা র্সা। না র্সা। না দা। পা পা I মা মা। -া মা।
ল চা মে লী শে ফা লি কা মি লি সা জা য়্ ডা

২ ০ ৩ ৪
। মা পা। মগা -পা। মা -গা। ঋা সা II
লি কি র ঙ্ গে • 'হে র'

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা সা II সা -ঋা। মা -া। মা মা। মা মা। পা -গা। গা গা I
এ কি প • দ্ম • ঘে রা স রো ব র এ কি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
I ঋা ঋা। গা গা। ঋা ঋা। সা -া। -া -া। সা সা I সা -দা।
কু মু দি নী ম নো হ র্ • • এ কি কূ ল্

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। দা দা। দা -া। পা দা। পা -া। দা -পা I মা -া। মা মা।
ভ রা জ ল্ ন দী ট ল্ ম ল্ ধা য়্ মৃ দু

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
| মা -পা | গা -পা | মা -া | পা পা I মা -দা | দা না | না র্সা |
ত ০ র ঙ্ গে ০ এ কি ল ০ ক্ষ পা খী র

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
| র্ঋা -া | -র্সনা র্সা | -া র্সর্সা I র্সা -র্ঋা | র্ঋা র্ঋা | র্গা -া | র্ঋা -া |
গী ০ ০০ তি ০ তরু ম র্ ম র বা য়্ নি ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
| -র্সনা র্সা | -া -া I দা -র্সা | র্সা র্সা | র্সা -া | না র্সা | -না দা |
০০ তি ০ ০ ঢে উ খে লে যা য়্ সো না র্ ক্ষে

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| পা -া I মা মা | মা মা | মা -া | মগা -পা | মা -গা | ঋা সা II
তে ০ ছ্ লা য়ে মৃ ছ্ ল্ ভ ঙ্ গে ০ 'হে র'

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা সা II সা -ঋা | মা মা | -া মা | মা -গা | -পা মা | গা গা I
এ কি শু ০ ভ্র স্নি গ্ ধ জ্যো ০ ৎ স্না শ শী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
I ঋা ঋা | গা গা | -পা গা | ঋা -া | -া সা | -া সসা I সা দা |
ত র ল রৌ ০ প্য ঢা ০ ০ লে ০ একি অ গ

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
| দা দা | -া -া | পা দা | পা পা | দা পা I মা মা | মা মা |
ণ ন ০ ০ তা র কা র ত ন জ্ব ল জ্ব ল

২ ০ ৩ ৪
| মা পা | গা -পা | গা -ঋা | -সা -া II
ন ভ থা ০ লে ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
II দা দা | দা দা | না র্সা | র্ঋা -া | -র্সনা র্সা | -া -া I র্সা র্ঋা |
গৃ হে গৃ হে বা জে বাঁ ০ ০০ শী ০ ০ ও ঠে

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
| র্ঋা র্ঋা | -র্গা র্গা | র্ঋা -া | র্সা -া | পা দা I দা র্ঋা | র্সা র্সা |
আ ন ন্ দ হা ০ সি ০ এ কি ম ধু রি মা

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
| না -া | নদা -া | পা -া | দা পা I মা মা | -া মা | মা পা |
লা ০ ব ০ শ্যে ০ হে র শ র ০ ৎ এ ল

০ ৩ ৪
| গা পা | মা -গা | ঋা ঋা II II
ব ঙ্ গে ০ 'হে র'

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

বিভাস—আড়াঠেকা।

তুমি কার কে তোমার কারে বল হে আপন,
মোহমায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন।
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু-বান্ধব,
সময়ে পালাবে তারা কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা রহিবে তব প্রাণপ্রিয়জন।
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস, নিষ্ঠুর শমন॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুর—৺ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১ ২´ ৩ ০
{ সা II সা সা -া রা। গা ধা -া -া। পা ধনা ধা পা। গা -া -া গা।
তু মি কা ০ র কে তো ০ ০ ০ ০০ মা ০ ০ ০ র কা

১ ২´ ৩ ০
। গা গা গা পা। পা -া গা -া। রা পা গা রা। সা -া -া } সা।
রে ব ল ০ হে ০ আ ০ ০ প ন ০ ০ ০ ০ মো

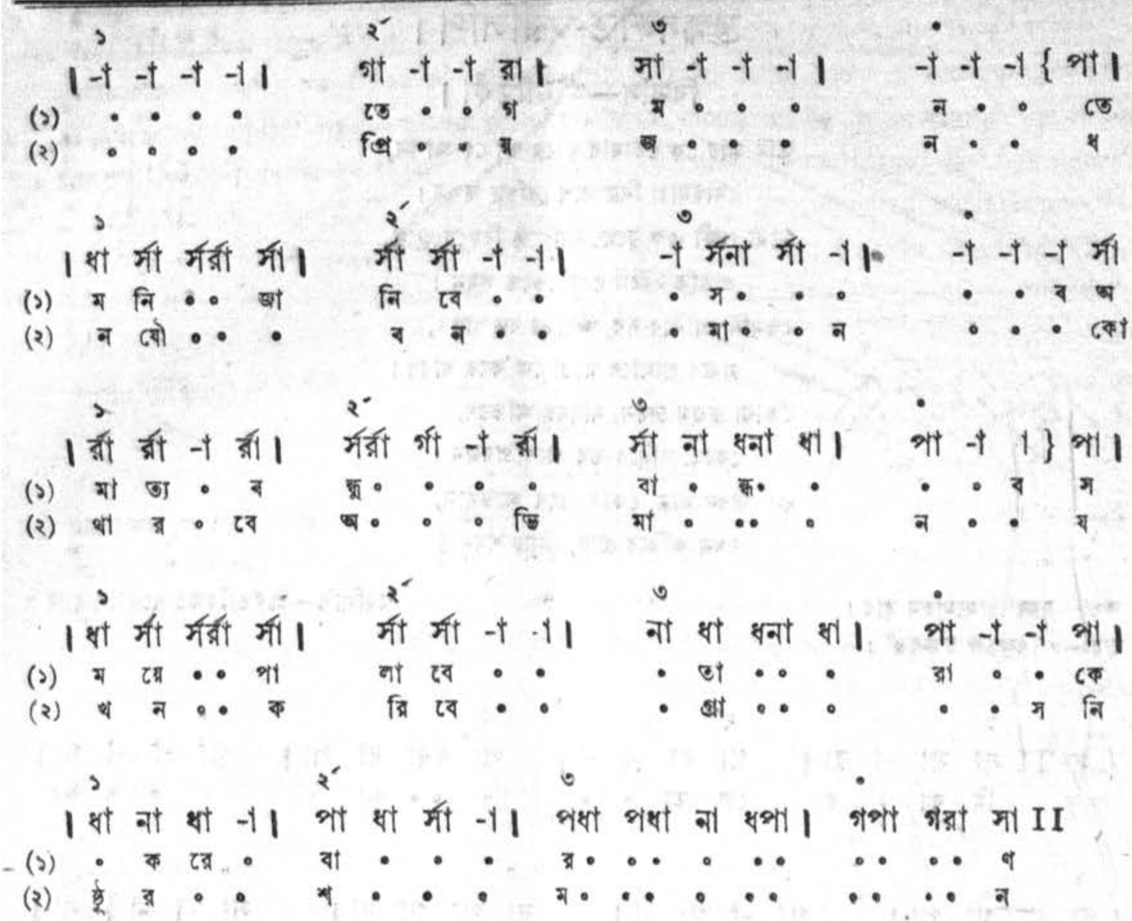
১ ২´ ৩ ০
। ধা ধা ধা -া। ধা -া ধা -া। না পা পা ধা। র্সা -া র্সপা পা।
হ মা য়া ০ নি ০ দ্রা ০ ০ ০ ব ০ শে ০ ০ দে

১ ২´ ৩ ০
। ধা না ধা -া। পধা র্সা ধা পা। গা পা গা রা। সা -া -া II
খি ছ স্ব ০ ০০ ০ প ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন

১ ২´ ৩ ০
গা II গা গা -া গা। পা -া গা -া। -া গা গা -া। রা -া -া গা।
(১) না না প ০ ক্ষী এ ০ ক ০ ০ বৃ ক্ষে ০ ০ ০ ০ নি
(২) কো থা কু সু ম চ ০ ০ ০ ০ ন্দ ন ০ ০ ০ ০ ম

১ ২´ ৩ ০
। রা গা পা পা। গা গা -া রা। গা -া রা -া। সা -া -া সা।
(১) শি তে ০ বি হ রে ০ ০ সু ০ ০ ০ খে ০ ০ প্র
(২) ণি ম ০ য় আ ভ ০ ০ র ০ ০ ০ ণ ০ ০ কো

১ ২´ ৩ ০
। ধা ধা -া ধা। পা -া পা -া। পা -া গা পা। গা গা -া -া।
(১) ভা ত ০ হ ই ০ লে ০ ০ ০ দ শ দি কে ০ ০
(২) থা র হি ০ বে ০ ০ ০ ০ ০ ত ব প্রা ণ ০ ০



Brahmo Dharma.

(Translated by Sm. Indira Debi B-A.)

CH. VIII.

64. *Vishwatashchakshuruta etc.*

His eyes are everywhere; He is the witness of all; He sees the inner and outer aspect of everything equally; even the deep darkness of black night cannot blind His sight. His face is everywhere; sinners behold His stern face, and the Pure in spirit behold His benign encouraging countenance. His arms are everywhere; in all the affairs of this universe His power and skill are manifest. His feet are everywhere. He dwells completely in all places. He attaches arms to the human form, and wings to the bodies of birds. He gives to every creature the special organs required for its functioning and enjoyment. That supreme Lord who is without a second, has created the terrestrial and celestial spheres.

65. *Sarvatah panipadantat etc.*

Knowing Him to be present everywhere O all men, be ye inspired to good deeds, and fear ye to do wrong.

66. *Sarvananashirogrivah etc.*

That supreme Lord, who is omnipresent and all-seeing, ever dwells in all hearts. He has created this wonderful universe for the good of all creatures. Whatsoever good is obtained by any person, he receives from that supreme Being who is goodness itself. He is the giver of our wisdom, our happiness and our salvation; He is the source of all good.

67. *Apanipadojabanogrihita etc.*

He has no hands or feet or limbs like finite little creatures; yet all functions of the hands and feet are performed with ease by His unthinkable divine power.

68. *Ya eshasupteshu etc.*

Whether we are awake or asleep, He remains ever awake and supplies all our various wants. When we rest from labour for our own good, even then He knows no rest. He works unceasingly for our welfare.

69. *Anoraniyan etc.*

He is finer than our souls, and mightier than the skies. He is not to be seen by distant travelling, for He dwells in our heart and mind and soul. He is free from all desire for enjoyment. He is ever content and full of joy; the seeker who obtains sight of him is comforted in his affliction,—and immersed in His love, he wants for nothing.

70. *Ekobashi etc.*

Everything is subject to Him, He is the ruler of all. He dwells within the souls of us all. Without help from anyone, He alone has created this marvellous universe; while remaining changeless in His identity, He has devided His one form into many forms, but has not become anything else Himself. He who sees within his own soul and communes with this one and only ruler, and inner spirit of all things,—he enjoys an eternal and transcendental bliss which is never attained by others.

71. *Nityoanityanam etc.*

All things in this world are perishable, He alone is eternal. He has created and endowed all creatures with consciousness; He preserves them by giving them sustenance; He alone fulfils all the desires of these His countless subjects. How many subjects has He in this one world alone, and how many are the wants of each. He supplies the wants of all by Himself according to their respective needs; He is not unmindful of the needs of even the meanest worm. They who perceive directly in the temple of their own hearts this supreme Deity who is goodness itself and the friend of all; their fount of satisfaction never runs dry, but remains full forever, and they attain peace everlasting.

72. *Yada sarve etc.*

Ignorance and illusion are the cords that bind our heart. Unless we destroy the cords of sinfulness and falseness that bind our hearts, it is not possible for us to attain to that supremely holy spirit. When you are able to cut these strong cords, then alone will you know that your feet are set on the path that leads to Him and enables one to dwell with Him forever, free from all fear and full of ineffable bliss; that you have passed beyond death and attained to that Holy spirit. This is the law, thus has it been taught us.

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীতরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য ভারতে একদিনেই সম্ভবপর নহে। হয় ত আমরা গবর্ণমেণ্ট হইতে সেরূপ কোন সাহায্য পাইব না। কিন্তু আমাদের নিজেদের চেষ্টায় তাহার প্রচলন করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অর্থ-সম্পন্ন, তাঁহাদিগের উপর দেশবাসীর দাবী আছে। তাঁহারা সমবেত হইয়া যেখানে পারেন এক একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থা করুন। ১০ হাজার বিঘা জমি লইয়া আমেরিকা হইতে মোটর ইঞ্জিন আনাইয়া কৃষির ব্যবস্থা করিতে পারিলে ও তাহার উপকারিতা হাতে হাতে বুঝা-ইয়া দিলে ফল যে কত মহৎ হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এইরূপ একটি প্রচেষ্টা হইতেই

অসংখ্য প্রচেষ্টার সৃষ্টি হইবে; সঙ্গে সঙ্গে বহু নরনারীর ভরণপোষণ সহজে নির্ব্বাহ হইবে।

আমি যেমন কৃষির উপর একদিকে ঝোঁক দিলাম—আমার মনে হয় ভারতে চরকারও তেমনি প্রয়োজন আছে। মহাত্মা গান্ধী চরকা সম্বন্ধে যে বাণী প্রচার করিতেছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জিনিষ। ইহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল। ৮০ বৎসরের রমণীরা পর্য্যন্ত সহজে আনন্দের সহিত সুতা কাটিতে পারেন। অবসরমত এক-আধ ঘণ্টা সুতা কাটিলে মনে বেশ একটু স্ফূর্ত্তি আসিবে আমাদের দেশের লোক স্বভাবতই একটু আলস্যপ্রিয়। আলস্য ত্যাগ করিয়া যদি অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোকও প্রতিদিন সামান্য আধ ঘণ্টা করিয়াও সুতা কাটেন, তাহা হইলে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ গজ সুতা জন্মিতে পারে। ইহা দ্বারা আমাদের দেশবাসীর বস্ত্রাভাব সহজে দূর হইতে পারে। চরকা আমাদের দারিদ্র্য দূর করিবার অস্ত্র এবং সেই জন্য দরিদ্র ভারতবাসীর আদরের ধন। ধনীদের মধ্যে যাঁহাদের দেশবাসীর প্রতি ভালবাসা আছে তাঁহাদিগকে আদর্শস্বরূপ হইতে হইবে। তাঁহারা যদি সুতা কাটেন দরিদ্র-দুঃখীরাও উৎসাহিত হইবে। তাহারাও তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই কথা মানিতেই হইবে যে, ১৯২১ সালে ভারতে চরকার প্রতি যে একটা আগ্রহ হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় মহাত্মা গান্ধীর সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভ্রমণকালে লিখিয়াছেন :—

"If the success of the visit of Mahatmaji is to be gauged by the strength of the crowd, a better success cannot be contemplated. But if it is to be measured by practical action as expected by Mahatmaji, it must be admitted with great regret that a greater failure cannot also be imagined. Wherever Mahatmaji goes, the crowd only want to see him and if they can only see him, they think that their duty ends there. * * *

হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ কথা অনেক দিন অবধি শোনা যাইতেছে। আমার মনে হয়, ভারতের সমস্ত লোক যদি ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারে, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ—যাহা আজ আমাদের জাতির অস্থিমজ্জা ক্ষয় করিতেছে, তাহার সত্য সত্য প্রতীকার সম্ভব হইবে। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধন করিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মত প্রচারের বিশেষ দরকার। কিন্তু হায়! আমরা নিজেরাই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছি না। আমাদের নিজেদের মধ্যে মিলনের অভাব। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া অব্রাহ্মের কার্য্য করিতেছি। ধনী ও দরিদ্রভেদে ব্রাহ্মসমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে চলিয়াছে। আমাদের সমাজের মধ্যে একতা ও সহৃদয়তার ভাব থাকিলে ত অপরে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করিবে। ধনী যাঁহারা তাঁহারা আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত—গরীবের খোঁজই রাখেন না। রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ত ধনাঢ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের জীবনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখি, ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁহারা কিরূপ সহৃদয় ছিলেন! *

গরীব ব্রাহ্মেরা এক সময়ে বিশেষ আদরের-পাত্র ছিলেন এবং দুঃখ-দুর্দ্দিনে ধনীদের নিকট হইতে তাঁহারা যথেষ্ট অর্থসাহায্যও পাইতেন। আমরা অর্থসাহায্য করা দূরে থাকুক, গরীব ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিতেও লজ্জা বোধ করি। আমাদের সমাজে এরূপ অনুদারতা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ব্রাহ্মসমাজ জাতীয় জাগরণের মূলে ছিল। শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের যে নব প্রেরণা আজ ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, হিন্দুসমাজ এখন যে এত উদার হইয়াছে—এই সকলের মূলে ব্রাহ্মসমাজই নয় কি? ব্রাহ্মসমাজ কাল যাহা বলিয়া গিয়াছেন, হিন্দু সমাজ আজ তাহা নিজের বলিয়া বরণ করিতেছেন। ভারতীয় নবজাগরণের মূলে ব্রাহ্মসমাজের গৌরব বিদ্যমান। ব্রাহ্মধর্ম্মকে বোম্বে অঞ্চলের লোকেরা অতি উচ্চ দৃষ্টিতে দেখেন। আমি

* ঋষি টলষ্টয় গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সাধারণ লোকের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন। একবার তিনি গরুর গাড়ীতে ১৭৫ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভ্রমণকালে যখনই যাহার দুঃখকষ্ট দেখিয়াছেন যথাসাধ্য তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রসাধারণকে দান করিয়া যান।

বোম্বে হইতে সিমলায় যাইতেছি—পথিমধ্যে দুইটী মহারাষ্ট্রীয় বালককে জগতে কোন্ ধর্ম্ম বড় এই লইয়া আলোচনা করিতে শুনিলাম। একজন বলিয়া উঠিল—ব্রাহ্মধর্ম্মই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। শুনিয়া আমার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাস্তবিক, সমস্ত ধর্ম্মের সার (essence) ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দুরা আমাদিগকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। মুসলমানেরা আমাদিগকে অনেক বিষয়ে সমধর্ম্মী বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন; আর খৃষ্টিয়ানরাও আমাদিগকে প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের বন্ধনরজ্জু, সকল সম্প্রদায়ের মিলনস্থান। এই মহান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও আজ অনেকে আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। শিলংএ একটা অনাথ-আশ্রম (orphanage) ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মেরা আর মনঃসংযোগ করেন না। সামাজিক হিসাবে ব্রাহ্মদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, কিন্তু আমরা ত তাহার খোঁজ লইতেছি না। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্র বাবু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, আমার পিতা হাজার মলিন বেশে থাকিলেও বলিতে বাধ্য যে, ইনিই আমার পিতা; সেইরূপ সুখে দুঃখে বিপদে আপদে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগের ধর্ম্ম। কিন্তু হায়! আমরা আপনার দোষে সে মহান আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছি না। আমরা আদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি। আমাদিগকে আবার প্রকৃত আধ্যাত্মিকতায় জাগিতে হইবে; আবার দেশের কাজে ও সমাজের কাজে এবং ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইতে হইবে।

পার্শীরা সামান্য একটি জাতি। বোম্বেতে দেখিবেন "Wadia Charitable Instiute", "Parsi Educational In-titute"প্রভৃতি অনেকগুলি বিদ্যালয় গরীব পার্শীদিগের জন্য ধনী পার্শীরা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমাজের প্রতি ধনী পার্শীদিগের গভীর ভালবাসা। গরীব পার্শীদিগের থাকিবার সুব্যবস্থার জন্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। বোম্বেতে ঘরভাড়া কলিকাতার দ্বিগুণ হইবে। কিন্তু গরীব পার্শীরা খুব অল্প ভাড়ায় সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ অট্টালিকায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের মেয়েদের শিক্ষার অভাব নাই। ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীশিক্ষার জন্য যথাসাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু পার্শী যুবতীরা যেরূপ শিক্ষিতা হইতে পারিয়াছেন বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা ত সেরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইতে পারেন নাই। পার্শীদিগের মধ্যে যেমন ধনীও আছে, তেমন গরীবও আছে। কিন্তু গরীব হইলে কি হইবে, সমাজের সহানুভূতি আছে, তাই তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অন্তরায় নাই।

এই শুধু নয়। ব্রাহ্মসমাজে বিবাহাদির কথা অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি এমন ঘর দেখি নাই যেখানে পিতা আক্ষেপ করিতেছেন না যে, তাঁহার সুযোগ্যা কন্যাকে কোন এক সুযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। কলিকাতা ত ব্রাহ্মদিগের কেন্দ্রস্থান। আজ ঘরে ঘরে যান—দেখিবেন ঐ একই হাহাকার। ব্রাহ্মসমাজে উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্ম বালিকার বিবাহ যেন জীবন-যুদ্ধ। কোন্ পিতা কোন্ প্রাণে তাঁহার উপযুক্তা কন্যাকে দরিদ্র ও অনুপযুক্তের সহিত বিবাহ দিতে পারেন? ব্রাহ্মসমাজে যুবক আছে; কিন্তু তাঁহারা সুযোগ না পাইয়া প্রতিভার বিকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনেকেই অতি কষ্টে অতি স্বল্প উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সমাজ ইহাঁদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন? কোন প্রতিভাবান পার্শী যুবক—সে যতই গরীব হউক না কেন—সে জানে তাহার সমাজ আছে। সমাজ তাহার বিকাশের জন্য বিদেশে থাকিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে তাহার জ্ঞানলাভের জন্য ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু আমাদের প্রতিভাসম্পন্ন যুবকদিগের প্রতিভা নীরবে ঝরিয়া যাইতেছে। তাহারা মানুষ হইলে সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইত। যে সমাজ তাহাদিগকে মানুষ করিতে সহায়তা করিবে তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সমাজের উপকারে ব্রতী হইবে। আমি বিশ্বাস করি, কাহারও মঙ্গল করিলে তাহার ফল একদিন-না-একদিন পাওয়া যায়। আমাদের সমাজ আজ কি এমন করিতেছেন যাহাতে

আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারি ?

ম্যাজিনি (Mazzini) 'সম্বন্ধজীবনের' (Collective-life) কার্য্যকে বড় উন্নত মনে করিতেন। তিনি "Young Italy" নামক তাঁহার কাগজে দেশবাসীকে বলিতেন—"তোমরা সকলে মিলে দেশের মঙ্গল কর। দেশ সকলেরই। সকলেই এক ব্রতে ব্রতী হও।" কিন্তু সম্বন্ধজীবনে (collective life) কার্য্যের সার্থকতা হয় যখন আমরা ব্যক্তিগতভাবে বড় হই। তাই মিল (Mili) বলিয়াছেন যে, একটি জাতি বিভিন্ন মনুষ্যের সমষ্টিমাত্র—A nation in the long run is the worth of individuals. সমাজ একদিকে যেমন বড় হইতে চলিবে, তেমনি এই সমাজ হইতেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে আবার নবভাবে শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারিবেন। যাঁহারা বলেন ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মসমাজের আর প্রয়োজন নাই, আমি বলিব তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ঠিক বুঝেন নাই। সত্য প্রচার করিতে, উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে ভারতকে একটি জাতিরূপে পরিণত করিতে, তাহার সামাজিক উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তার করিতে ব্রাহ্মসমাজকে চিরদিনই আদর্শরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। আমাদের মলিনতায় ব্রাহ্মসমাজ নিস্প্রভ বলিয়াই কি বলিব সত্যধর্ম্ম শেষ হইয়াছে ? ভারতে ইহার কোন প্রয়োজন নাই ? মহাত্মা কার্লা-ইল (Carlyle) বলিতেন—ঈশ্বর ভীরুর নিকট কখনই প্রকাশিত হন না। বাঙ্গালী জাতি কি এমনি ভীরু জাতি ? ভারতবাসী কি এমনি অবনত যে, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে না ? মুখে ব্রাহ্ম নই বলিলে কি হইবে ?—ভারতবাসী যে অন্তরে বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত ধারণ করিয়াছে। বোম্বেতে প্রার্থনাসমাজে মারাঠী ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া কে না পুলকিত হইয়াছেন ? লাহোরে ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুস্থানীতে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া কে না মনে মনে বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত ভারতে প্রচারিত হউক। আমাদের প্রচারকেরা বড় 'একঘেঁয়ে' হইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন। বলিতে পারি না, হয় ত সমাজই তাঁহাদিগকে নিরাশ করি-য়াছে। কিন্তু প্রকৃত সত্যান্বেষী যিনি, তিনি কিছু-তেই নিরাশ হন না। যাঁহারা আমাদের মন্দিরে উপাসনা করিবেন তাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত করিয়া নূতন নূতন ভাব দিতে বাধ্য। নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটন বলিতেন—"তুমি যখনি যা বল তার প্রত্যেক কথায় জোর থাকা চাই—তোমাকে নতুন ভাব দিতে হ'বে"। একদিন উপাসনা করিবেন বলিয়া খৃষ্টীয় প্রচারকগণের সর্ব্বক্ষণই একটা চেষ্টা থাকে যে, তিনি যেন সেদিনকার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন; যেন উপাসনার মধ্যে এরূপ নূতন ভাব দিতে পারেন, যাহাতে শ্রোতারা আকৃষ্ট হয় এবং অল্পকালের জন্যও ভগবানকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারে। ইহার বিপরীতে আমাদের প্রচারকেরা সংসারের দুঃখকষ্টে দারিদ্র্য ও দৈন্যের ভিতরে থাকিয়া তেমন প্রাণ খুলিয়া কিছুই বলিতে পারেন না; চিরদিন উপাসনায় যাহা বলিয়া আসিতেছেন তাঁহাই যেন পুনরাবৃত্তি করিয়া যান; নূতন কিছু অধ্যয়ন-আলোচনা করিয়া উপাসনা করিবার অবসর পান বলিয়া মনে হয় না। আমাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষিত এক প্রচারকসম্প্রদায় গঠন করিতে হইবে। তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের সুচারুরূপে ভরণপোষণের ভার সমাজকে নিজ স্কন্ধে লইতেই হইবে। খৃষ্টীয় প্রচারকদের জন্য খৃষ্টীয় জগত কতই করিতেছেন, আর আজ আমরা বলিতে গেলে আমাদের প্রচারকদিগকে নিরন্ন রাখিয়া দিয়াছি! সত্যের আর অবমাননা করিও না। হৃদয় প্রসারিত কর। ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত কর। দরিদ্র প্রচারকগণের অর্থকষ্ট দূর কর। এই ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে দলাদলি বিদূরিত কর। জান যে আমরা সকলেই ব্রহ্মোপাসক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার আর সময় নাই। তুমি আদিসমাজের ব্রাহ্মই হও বা নববিধানসমাজের ব্রাহ্মই হও অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মই হও, সকলেই এক পরমে-শ্বরেরই উপাসক। সকলে সম্মিলিত হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি করিতে পারি সেই সম্বন্ধে মনোযোগ দাও। আমাদের মন এত

সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে আমরা ধর্ম্মের যাহা সার-ভাগ তাহা গ্রহণ করি না। আমরা ক্ষুদ্র অবাস্তব বিষয় লইয়া দলাদলি করিতে ভালবাসি; ফলে ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন সাধন করি। কিন্তু যাহা সত্য তাহা কদাপি লুপ্ত হইবে না। তুমি বিতণ্ডা করিয়া নিজেকেই হীন করিতেছ; কিন্তু তুমি তোমার ধর্ম্মকে হীন করিতে পার না, এ কথা যেন মনে থাকে। তোমার দুর্বুদ্ধিকে তোমার পুত্রেরা সত্যান্বেষী হইয়া ভবিষ্যতে উপহাস করিবে, তাহারা বলিবে, পিতা আমার সত্যধর্ম্মের অবমাননা করিয়া গিয়াছেন; সত্যধর্ম্মের স্ফুরণের পথে অন্তরায় হইয়া গিয়াছেন। তাই আবার বলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন, জাতীয় জাগরণ ও সমাজ-সংগঠনে ব্রাহ্মসমাজের কাজ চিরকাল রহিবে। চার্লস্ ফ্লেচার ডোলএর ভাষায় আমরা বলিতে চাই যে, আমরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং সেই গঠন কার্য্যে ভাল উপদান সকল ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু উহাদিগকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখিলে ক্রমে ভূমিসাৎ হইবে। * ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও শুভ ইচ্ছার বন্ধনের অভাব হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অনিবার্য্য।

পার্শ্বনাথ-চরিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি-এ)

বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার রাত্রিতে বামাদেবী গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময় চারিপ্রকার * দেবতার আসন কম্পিত হইল এবং তাঁহারা সকলে বিমানে চড়িয়া 'গর্ভকল্যাণক' † উৎসব করিবার জন্য বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তীর্থঙ্করের মাতা ও পিতাকে সিংহাসনের উপর বসাইয়া সুবর্ণ কলসের জলের দ্বারা তাঁহাদের অভিষেক করিলেন; নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহারা রাজা ও রাণীকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং গর্ভস্থ তীর্থঙ্করকে বারবার নমস্কার করিতে লাগিলেন।

এদিকে গর্ভধারণ করিয়া বামাদেবীর কোন প্রকার কষ্টই বোধ হইতে লাগিল না। গর্ভের যে একটা গুরু ভার আছে, একথা তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। গর্ভাবস্থায় সাধারণ স্ত্রীলোক যেরূপ কষ্টভোগ করে তাহার কিছুই তাঁহাকে করিতে হইল না।

পূর্ণ নয়মাস কাল গর্ভধারণ করার পর পৌষমাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন ভগবান পার্শ্বনাথের জন্ম হইল। স্বর্গ হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ আসিয়া 'জন্মকল্যাণ' উৎ-সবের অনুষ্ঠান করিলেন। মাতা-পিতার সাক্ষাতেই তীর্থঙ্করের নাম রাখা হইল পার্শ্বনাথ। অতঃপর তাঁহার সেবার জন্য উপযুক্ত দেবগণকে রাখিয়া অন্য সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।

পার্শ্বনাথ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অষ্টম বর্ষ বয়সেই তিনি শ্রাবকের আচরণীয় দ্বাদশ প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* Charles Fletcher Dole বলেন—"We have proceeded very much as men do in building a structure, for example an archway. We have used the best material. We have set the base of our structure into the concrete matter of all sorts of facts of life. We have laid logic and reason for foundation stones. We have built the vaults of order, beauty, justice, truth, humanity and love into our work. We have found a place for every noble experience of sympathy, of sorrow, of victory for every aspiration, for every mighty standard. All the high things that make life worth living are in our structure. The name of the structure is universal life; it means the integrity of man and the reality of God.

"There is just one stone which we need to make the arch complete. It is the keystone of the work. It is small compared with the massive foundation; one might possibly think that the columns should stand apart by themselves. They would stand for a while if no great stress were put on the work. But our sense of form and perfection, that is, our sense of truth or fitness calls for the key-stone in order to join the piers and spring-ers together. Our sense of necessity also and our knowledge of the action of forces call for the keystone. Our arch will never be safe till we have put that one binding stone into place"

* জৈনমতে দেবতাদিগের চারিপ্রকার ভেদ আছে। কল্পবাসী দেব, ভবনবাসী দেব, ব্যন্তর দেব ও জ্যোতিষ্ক দেব।

† প্রত্যেক তীর্থঙ্করের গর্ভপ্রবেশ, জন্ম, দীক্ষাগ্রহণ, কেবল জ্ঞানলাভ ও নির্ব্বাণলাভের সময় স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া যে যে উৎসব করেন তাহার এক-একটীর সাধারণ নাম 'কল্যাণক'। উহা-রাই 'গর্ভকল্যাণক' প্রভৃতি নামে পরিচিত। আজকালও জৈনগণ দেবগণকৃত এই সকল উৎসবের অনুকরণ করিয়া এই 'পঞ্চকল্যাণক' উৎসবের অনুষ্ঠানোপলক্ষে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

অনেক দেবতাও তাঁহার সহচররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে কখন হাতীতে বা ঘোড়াতে চড়িয়া বাগানে বেড়াইতে যাইতেন, কখনও বা জলে নামিয়া জলক্রীড়া করিতেন। পার্শ্বনাথের শরীরের বর্ণ হইল নীল এবং তাঁহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে শরীরের উচ্চতা হইল নয় হাত। উহাই তাঁহার দেহের পূর্ণ উচ্চতা।

তিনি একদিন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। সেই সময়ে পিতা যাইয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখন তোমার বয়স হইয়াছে। তুমি এখন বিবাহ কর। তাহা হইলে আমাদের বংশ রক্ষা পাইবে। আদি তীর্থঙ্কর ভগবান আদিনাথ যেমন পিতা নাভিরাজের কথামত বিবাহ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর।'

পিতার এই কথা শুনিয়া পার্শ্বনাথ বলিলেন—'আদিনাথের সহিত আমার তুলনা হইবে কিরূপে? আমার জীবনকাল মাত্র একশত বৎসর। তাহার মধ্যে ষোল বৎসর ত ইতিমধ্যেই ছেলেখেলায় অতিবাহিত হইয়া গেল। আর ত্রিশ বৎসর বয়সে আমি দীক্ষা গ্রহণ করিব। সুতরাং এই অল্প সময়ের জন্য সুখভোগ করিবার নিমিত্ত এত আয়োজনের প্রয়োজন কি?' রাজা বিশ্বসেন পুত্রের বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই দেখিয়া মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হইলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ইহাই ভবিতব্য, তখন তাঁহার দুঃখ অনেকটা উপশমিত হইল।

এদিকে কমঠের জীবাত্মা সিংহজন্মে মুনিকে হত্যা করিয়া মরিবার পর পঞ্চম নরকে যাইল। সেখানে সতের সাগর পরিমিত কাল দুঃখভোগ করার পর তিন সাগর কাল পশুযোনিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন পশুজন্মে সে অজ্ঞাতসারে হয় ত কোন শুভ কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই এই সময় সে মহীপালনামক নগরে মহীপাল নামক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই মহীপালেরই কন্যা পার্শ্বনাথের মাতা বামা দেবী।

পাটরাণীর মৃত্যু হইলে মহীপাল অতিশয় দুঃখিত হইয়া সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিল এবং সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া বনমধ্যে যাইয়া 'পঞ্চাগ্নিসাধন' * করিতে লাগিল। তাহার মাথায় দীর্ঘ জটা জন্মিয়াছিল এবং তাহার পরিধানে ছিল মৃগচর্ম্ম। এইরূপ বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সে বারাণসীর সমীপস্থ বনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সময় পার্শ্বনাথ অনেক দেবতার সহিত বনক্রীড়া করিবার জন্য হাতীতে চড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, মহীপাল পঞ্চাগ্নিসাধন করিতেছেন। পার্শ্বনাথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিতে লাগিলেন। মহীপাল তাহাকে সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'আমি ইহার মাতামহ—তাহাতে আবার তপস্বী। তথাপি আমাকে দেখিয়া এ নমস্কার বা কোনরূপ সম্মান করিল না। ওঃ! ইহার কি দাম্ভিকতা!'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখস্থ আগুনের কাষ্ঠ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি একখানি কাষ্ঠ লইয়া উহাকে কুঠার দিয়া চিরিতে উদ্যত হইলেন। পার্শ্বনাথ তাহা দেখিতে পাইয়া মিষ্টভাবে বলিলেন—'আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ কাঠখানি চিরিবেন না। ইহার মধ্যে এক নাগ ও এক নাগিনী রহিয়াছে।'

ইহা শুনিয়া তপস্বীর ক্রোধ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল এবং সে বলিয়া উঠিল—'বালক! তুমি কি সর্ব্বজ্ঞ না কি? ইহার মধ্যে কি আছে তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে? তোমার তো দাম্ভিকতা দেখিতেছি অতি বেশী!'

এই বলিয়া পার্শ্বনাথের নিষেধসত্ত্বেও মহীপাল যেমন কাষ্ঠের মধ্যে নিজ কুঠার প্রবেশ করাইয়া দিল অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্য হইতে এক নাগ ও এক নাগিনী দ্বিখণ্ডিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পার্শ্বনাথের হৃদয় দয়ার্দ্র হইল এবং তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়া তপস্বীকে বলিতে লাগিলেন—'আপনি বৃথা তপস্যা করিতেছেন। আপনার হৃদয়ে জ্ঞান বা দয়ার লেশমাত্র নাই। জ্ঞান না থাকায় আপনি নিরর্থক এই শরীরকে কষ্ট দিতেছেন।'

এই কথা শুনিয়া তপস্বী পুনরায় বলিল—'বালক! তুমি কি জান না যে আমি তোমার মাতামহ—তোমার মাতা আমারই ঔরসজাতা কন্যা। তারপর আমি তাপস। তাহাতে তুমি আমার সম্মান করা ত দূরে থাকুক—কেবল আমাকে নিন্দা করিতেছ। আমি এই অসহ্য অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়া পঞ্চাগ্নি সাধন করিতেছি—এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া এক হাত উচ্চ করিয়া সারাদিন তপস্যা করিতেছি—ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করিয়াছি। গাছের শুষ্ক পাতা খাইয়া আমি জীবন ধারণ করিতেছি। আর তুমি কিনা আমার এই তপস্যাকে জ্ঞানহীন তপস্যা বলিতেছ?'

পার্শ্বনাথ মধুরভাবে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

* ইহা একরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা।

'আপনার এই তপস্যা হিংসা-পাপে পূর্ণ। আপনার জন্যই প্রতিদিন বহু প্রাণী এই অগ্নি মধ্যে প্রাণ হারাইতেছে। অল্পমাত্র হিংসা করিলেও পাপ জন্মে এবং তাহার ফলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এইজন্যই আপনার তপস্যা নিরর্থক। জ্ঞান না থাকিলে নিরন্তর কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া তপস্যা করিলেও তাহাতে কোনও সুফললাভ হয় না। বনমধ্যে দাবাগ্নি জলিয়া উঠিলে যেমন কোন অন্ধ আকুল হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করে, কিন্তু সেই বন হইতে কোন প্রকারে বাহির হইতে না পারিয়া আগুনে পুড়িয়া মরে; সেইরূপ অজ্ঞান জীব কায়ক্লেশ সহ্য করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু সংসাররূপ দাবাগ্নি হইতে কোন প্রকারেই রক্ষা পায় না। কিন্তু হাত-পা থাকিতেও যদি এ দাবাগ্নি হইতে বাহির হইবার উপায় না করা হয় তাহা হইলে এই অগ্নিতে পুড়িয়াই মরিতে হইবে। এই জন্য তপস্যা করিতে হইলে পূর্ব্বে জ্ঞানলাভ করা চাই এবং আর চাই বিশ্বাস। জ্ঞান, চরিত্র ও বিশ্বাস এই তিনটী হইলেই বাঞ্ছিত ফললাভের আশা করা যায়। অতএব, আপনি জিন-মতানুসারে চলিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করুন এবং এই সকল নিরর্থক কায়ক্লেশ ছাড়িয়া দিন। আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি। যদি আপনার ভাল মনে হয় তবে আমার কথা মত কার্য্য করিতে পারেন।'

যে দুই নাগ ও নাগিনী খণ্ডিত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহারা মহাপুণ্যের ফলে তীর্থঙ্করের দর্শনলাভ করিয়া জন্ম সার্থক করিল এবং মরিবার সময় তাঁহার মুখনিঃসৃত উল্লিখিত উপদেশ শুনিয়া শান্তচিত্তে মরিল। উহার ফলে তাহারা মৃত্যুর পরে ধরণেন্দ্র ও পদ্মাবতীরূপে * জন্মগ্রহণ করিল। কিছু দিন বাদে মহীপালের মৃত্যু হইলে সে জ্যোতির্বাসী শম্বর নামক দেবতা হইল।

এদিকে পার্শ্বনাথের বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, তখন একদিন অযোধ্যার রাজা জয়সেন তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তিবশতঃ কয়েকটী ঘোড়া ও অন্যান্য বহু বস্তু সহ একজন দূত তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া আসিয়া দূত দেখিল পার্শ্বনাথ সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন। তখন সে তাঁহাকে যথানিয়মে নমস্কার করিয়া জয়সেন কর্তৃক প্রেরিত সমস্ত জিনিষই তাঁহার সম্মুখে রাখিল এবং বলিল—'রাজা জয়সেন আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া এই সকল জিনিষ আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।'

পার্শ্বনাথ তখন তাহার নিকট অযোধ্যার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। যে সকল তীর্থঙ্কর অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন, দূত একে একে তাঁহাদের কথা পার্শ্বনাথের নিকট বলিয়া গেল। তাহা শুনিয়া পার্শ্বনাথের চিত্তে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল এবং তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"সকলের শ্রেষ্ঠ যে ইন্দ্রপদ তাহাও আমি যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি; কিন্তু তাহাতেও আমি তৃপ্তি পাই নাই। সুতরাং এই ক্ষুদ্র মনুষ্যজীবনের সুখে আমার তৃপ্তি হইবে কিরূপে? সমুদ্রপ্রমাণ জল পান করিয়াও যাহার পিপাসা মিটিল না, বিন্দুমাত্র জলে তাহার সে পিপাসা মিটিবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, অগ্নিতে ইন্ধন জোগাইলে অগ্নি যেমন না নিবিয়া দিন দিন বৃদ্ধিলাভ করে সেইরূপ বিষয়ভোগেও মানুষের ভোগবাসনা শান্ত না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে।

"এই বিষয়ভোগ অতি ভীষণ পদার্থ। ইহা আপাত রমণীয় সত্য, কিন্তু ইহার ফল অতি ভয়ানক। বিষমিশ্রিত ফলাদি যেমন খাইবার সময় ভাল লাগিলেও পরিণামে প্রাণনাশক হয়, সেইরূপ বিষয়ভোগও পরিণামে জীবের প্রাণঘাতক হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা সত্ত্বেও জীব এই ইন্দ্রিয়সুখের মোহে মুগ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে এই সুখের লালসায় ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে ও মরিতেছে। ইন্দ্রিয়-সুখের বশীভূত হইয়া জীব কাহারও উপদেশ গ্রাহ্য করে না। ইহারই জন্য মানুষ প্রতিদিন নানারূপ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। মানুষ যে জীবহিংসা করে, সে এই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্যই; চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ—সকলই মানুষ এই সুখের আশাতেই করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, এই পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থ প্রতিদিন সঙ্ঘটিত হইতেছে তাহার সকলই এই বিষয়সুখের জন্য। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সুখলাভ অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না; পরন্তু সুখের পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার দুঃখদুর্গতিই লাভ হইয়া থাকে। অতএব এতাদৃশ বিষয়-ভোগের প্রতি অনুরাগ সর্ব্বথা ত্যাগ করা উচিত।

"আমি আমার জীবনের এতদিন অনর্থক নষ্ট করিয়াছি। এতদিন যে বৃথাই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহা আমার মনেও পড়ে নাই। মোহের বশীভূত হইয়া আমি এতদিন তপশ্চরণ করি নাই। যাহা হউক, এখন আর সময় নষ্ট করিব না। এখন কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া আমি দীক্ষা গ্রহণ করিব এবং মুনিদিগের মত তপশ্চর্য্যা করিব।"

* ধরণেন্দ্র ও পদ্মাবতী পাতাললোকের অধীশ্বর ও অধীশ্বরী। ধরণেন্দ্র হিন্দুদিগের অনন্তনাগের অনুরূপ।

৭

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের একপৃষ্ঠা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

শ্রদ্ধেয় কেশব বাবু যখন আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং উহার পরে যখন 'তিন আইন' মতে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ হয়, তখন হইতেই 'ব্রাহ্ম'নামের বিশেষ প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। আদিব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা পড়িয়া রহিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। তদবধি লোক-সংখ্যা গণনার সময় তাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া লিখাইয়া আসিতেছেন। বিচ্ছিন্ন দলের ভিতরে সঙ্কর বিবাহ চলিতে লাগিল, এবং স্ত্রীস্বাধীনতাও অতিরিক্ত পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বিশেষত 'তিন আইনের' বিবাহের স্বীকারোক্তি মতে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিবার অধিকার তাঁহাদের বিলুপ্ত হইল। অথচ এই দলের অধিকাংশ ব্যক্তি অন্যান্য বিষয়ে—আচারে ব্যবহারে আহারাদি বিষয়ে—হিন্দুর বহুল আচার আপনাদের মধ্যে চালাইয়া থাকেন। অবশ্য যাঁহারা বিলাতপ্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দলভুক্ত, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। 'তিন আইন' মতে পাত্র-পাত্রীকে স্বীকার করিতে হয় যে আমরা হিন্দু নহি, মুসলমান, খৃষ্টান বা বৌদ্ধ নহি। 'আমি হিন্দু নহি' এ কথা বলিতে অনেকের প্রাণে বাজে। এইরূপ বিচ্ছিন্ন-ভাবে আত্ম-পরিচয় দিতে অনেকের বিশেষ কুণ্ঠাবোধ হয়। ক্রমে কেশব বাবু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব হয়। কেশব বাবু নিজের শেষ জীবদ্দশায় 'নববিধান' প্রচার করেন এবং তাঁহার দলবর্ত্তীগণ 'নববিধান-সংহিতা' মতে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নববিধান ঘোষণা হইবার পূর্ব্বেই কেশব বাবু হইতে পৃথক হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা নববিধান গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাহা সত্বেও কেশব বাবুর দল ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দল উভয়েই 'তিন আইন' মতে বিবাহ দিয়া থাকেন। সঙ্কর বিবাহকে আইন অনুসারে প্রামাণ্য করিবার এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যেখানে সমান বর্ণে বিবাহ হয়, সেখানে 'তিন আইনের' শরণাপন্ন না হইলেও চলিতে পারে; কিন্তু কি সবর্ণ কি অসবর্ণ উভয়বিধ বিবাহেই 'তিন আইনের' ব্যবস্থা নানা কারণে চলিয়া আসিতেছে। 'তিন আইন' মতে বিবাহিত পুরুষ, স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু পুরুষ বা স্ত্রী ইচ্ছা করিলে আদালত সাহায্যে বিবাহচ্ছেদ করিতে পারেন। হিন্দু-বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহচ্ছেদ হইতে পারে না। তবে স্ত্রী যদি কুলটা হইয়া যায়, সে স্বতন্ত্র কথা। আদিব্রাহ্মসমাজের বিবাহ হিন্দুবিবাহ; ঐ বিবাহে কন্যা দান ও প্রতিগ্রহ আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক সম্প্রদায় "দান" শব্দের বিরোধী।

আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন প্রথম দল আপনা-দিগকে সমুন্নত ও বিশেষভাবে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। সঙ্কর বিবাহাদিতে অগ্রসর না হওয়ায় আদিব্রাহ্মসমাজ conservative অর্থাৎ অনুন্নত এবং বিচ্ছিন্ন দল progressive অর্থাৎ উন্নত আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের ভিতর স্বাভাবিক মনোবাদ আসিয়া পড়িল। এই উত্তেজনার যুগে বিচ্ছিন্ন দল আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। আদিসমাজের লোকেরা একভাবে হিন্দু-সমাজের ভিতরে পড়িয়া রহিলেন।

আদিব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ছিল একেশ্বরের উপাসনা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা হইল ব্রাহ্ম-সমাজের অধীনে সাহিত্য-শাখা। এই সাহিত্য-শাখায় তৎসময়ের কলিকাতার যাবতীয় গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ হইত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ মনীষীগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ছাতু বাবু, লাটু বাবু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদার তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যতালিকা-ভুক্ত ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উক্ত সভার মুখপত্র ছিল। উহাতে ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কথা, এবং তাহা ছাড়া বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সবই থাকিত। মহর্ষির অভিপ্রায় ছিল তত্ত্ব-বোধিনী সভার ভিতর দিয়া সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মণ্ডলীকে ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদের দিকে আহ্বান করা। তত্ত্ব-বোধিনী সভার পরিচালন-ভার, অনেকদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন সিংহের উৎসাহে ও সাহায্যে উক্ত পত্রিকায় মহা-ভারতের আদিপর্ব্বের অনুবাদ অনেক দিন ধরিয়া বাহির করেন। উক্ত সভার অধিকাংশ লোকই সাধারণ হিন্দু ছিলেন, তাহা সত্বেও রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে বিনষ্ট না হইয়া যায়, সেদিকেও তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সমাজের অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে তত্ত্ববোধিনী সভা উহাকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার দল আদিব্রাহ্মসমাজে যখন প্রবল হইয়া দাঁড়াইল, উক্ত সভার নিষ্ঠাবান হিন্দু সভ্য-

গণ নিজেদের মর্য্যাদাহানি ভয়ে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ঐ কারণে সরিয়া পড়িলেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা রহিল বটে, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা ক্রমে উঠিয়া গেল। এই তত্ত্ববোধিনী সভা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ হিন্দু-সমাজের সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের সৌহার্দ্য ঈষৎ ম্লান হইয়া পড়িল মাত্র। ব্রহ্মোপাসনা ও সাহিত্য-চর্চ্চা এই উভয় দিক বজায় রাখিতে পারিলে, আদিব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী হইতে পারিতেন। মাসের প্রথম রবিবার তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশন হইত। তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু উহার স্মৃতি-রক্ষা স্বরূপ বাঙ্গালা মাসের প্রথম রবিবার প্রাতে আদিব্রাহ্মসমাজে উপাসনা আজও হইয়া থাকে।

মনোমালিন্য ঘনীভূত হইয়া যখন পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়া দেয় তখন প্রকৃত সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবার সহিষ্ণুতা চলিয়া যায়। আদিব্রাহ্মসমাজ উপনিষদাদি শাস্ত্র ধরিয়া রহিলেন। কেশব বাবু উপনিষদাদির সহিত বড় পরিচিত ছিলেন না; তিনি প্রচার-কার্য্যে প্রধান আশ্রয় ধরিলেন বাইবেল। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা ও বাগ্মীতা ছিল। তিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ সবল ও সহজযুক্তি এবং তদুপরি বাইবেলের অবলম্বনে দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইলেন, সমাজ সংস্কারের দিকে তাঁহার অত্যধিক ঝোঁক পড়িল। তাঁহার মতে আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি তাঁহার হিন্দুসমাজের সহিত বিচ্ছেদমূলক আগামী বক্তৃতা-শক্তি নিয়োগ করিলেন। সে সময়ের শিক্ষিত-মণ্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও উপাধিধারী-গণের উপরে তিনি তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে স্বাধীন চিন্তার ধারা জনসাধারণের চিত্তের ভিতরে আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার যে যথেষ্ট মূল্য ছিল এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রাজা রামমোহন একেশ্বরবাদকে সাজাইয়াছিলেন দেশীয় পরিচ্ছদে, কিন্তু কেশববাবু ঐ ভাব রক্ষা করেন নাই। কেশব বাবু যদি তাঁহার প্রচারের প্রথম অবস্থায় দেশীয় ভাবের ভিতর দিয়া এবং সমাজের উপর সমধিক আঘাত না করিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতেন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে, শতগুণ ফল লাভ করিতে পারিতেন; অসংখ্য অগণ্য লোক ব্রাহ্মসমাজের পতাকার নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইত এবং একেশ্বরবাদ-প্রচার—যাহা রাজার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাহা কেশববাবু দ্বারা বহুলপরিমাণে সংসিদ্ধ হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাইবেল কেশববাবুর অস্ত্র ছিল; যিশুখৃষ্টই তাঁহার নিকট আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ইহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে এই অবতারবাদ উল্টাইয়া তাঁহাকেই দংশন করিল। অবতারবাদ বিচূর্ণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব এবং প্রথম বয়সে কেশব বাবুর অতিরিক্ত চেষ্টা ছিল; কিন্তু শেষে তাঁহার ভিতরেই আদেশ প্রত্যাদেশ ও প্রত্যাদিষ্ট মনুষ্যবাদ প্রভৃতি স্থান পাইতে লাগিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণ তাহাতে সায় দিতে না পারিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি করিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেশব বাবু তাঁহার মতবাদকে "নববিধান" নাম দিলেন।

শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার পর যখন প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বাইবেল হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তদবলম্বনে প্রায়ই উপদেশ দিতেন। এ ধারা তাঁহারা কেশব বাবুর নিকট পাইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃতে এম-এ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমকার উপদেশে নিজের সংস্কৃত শিক্ষার পরিচয় তিনি বড় দিতেন না।

আমরা 'তত্ত্বকৌমুদীতে' বা 'মেসেন্জরে' প্রায় কুড়ি বৎসর হইল পাঠ করিয়াছিলাম যে,—'রাজা রামমোহন রায় প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন না—কেননা তাঁহার উপবীত ছিল; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাহাই—কেন না তিনি উপ-নয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। কেশববাবুও প্রকৃত ব্রাহ্ম নন—তিনি নববিধানী; প্রকৃত ব্রাহ্ম যদি বলিতে হয় তবে আমরা।' কিন্তু শ্রদ্ধেয় শিবনাথ বাবুকে 'ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে' দুইটি নবাগত ব্রাহ্মের দীক্ষা উপ-লক্ষে বলিতে শুনিয়াছি যে,—"ব্রাহ্ম হওয়া বড় কঠিন; এতদিন ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে রহিয়াছি, এখনও ব্রাহ্ম-জীবন লাভ করিতে পারি নাই, এখানকার জীবনে পারিব কি না সন্দেহ!" আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম, তাঁহার এই বিনয়পূর্ণ কথায় আনন্দ লাভ করিলাম।

ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সীতানাথ বাবু প্রভৃতির চেষ্টায় সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত উপনিষদ-গ্রন্থের সুন্দর সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। তিনি উহার রসপানে বিভোর হইয়া আজ কয়েক বৎসর তাহা প্রচার করিতেছেন। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় উহার পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রচার-ক্ষেত্রে অতিরিক্তমাত্রায় বাইবেলের উপর নির্ভর করা সমীচীন হয় নাই। তিনি বলেন—'ব্রাহ্মধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ এ কথায় আপত্তি আমি দেখি না।' তাহার প্রতিবাদ বিগত ১৩ই সেপ্টে-ম্বরের 'মেসেঞ্জার' নামক পত্রে বাহির হইয়াছে। সম্পা-দকীয় স্তম্ভে সম্ভবত শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম শিবনাথ বাবুর কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে,—"সময় আসিবে যখন লোকে বুঝিবে যে ব্রাহ্মসমাজ সমুচ্চ হিন্দুধর্ম্মের

পরিপোষক।" আর একস্থানে শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে—"আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র পাঠ ও প্রাচীন সাধনার পথে অগ্রসর হইবার ভাব ব্রাহ্মসমাজে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।" প্রতিবাদকারী শ্রীশশীভূষণ দত্ত, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বলিতে চান যে—"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী সার্ব্বভৌমিক; বিশ্বমানবের সহিত ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ হওয়া ও ভগবানের পিতৃত্বে বিশ্বাস করাই ইহার আদর্শ। আমরা এই কারণে বলিতে চাই যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্মের ঠিক পরিণতি নহে।" তদুত্তরে তত্ত্বভূষণ লিখিয়াছেন যে—"ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু-প্রকৃতি সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বিরোধী নহে; ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ইতিহাসকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যাঁহারা অতিমাত্রায় ইহাকে বিশ্বব্যাপক করিবার অভিলাষী, তাঁহাদের মধ্যে দেশীয় শাস্ত্র পাঠ করিবার ভাব ম্লান হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা দেশীয় আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, অথচ দেশীয় বা বিদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে বিমুখ হইয়া তাঁহারা ক্রমে নাস্তিক্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন। সার্ব্বভৌমিকত্বের অনুরাগী হইয়াও রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু-আকার দিয়াছিলেন। কেশববাবু প্রথম অবস্থায় বাইবেলের অনুরাগী থাকিলেও পরে দেশীয় ভাবের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। শিবনাথ বাবুতেও ঐরূপ ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ডাক্তার ভাণ্ডারকর ও শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঐরূপ মত পোষণ করেন। "ব্রাহ্মগণ হিন্দু" ইহাই তাঁহাদের সুব্যক্ত মত।'

আমাদের কথা এই যে, তত্ত্বভূষণ একজন বিশেষ চিন্তাশীল প্রবীণ ব্যক্তি। উপনিষদাদিতে তাঁহার মত অভিজ্ঞতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বলি কেন, বাহিরেও কম। প্রাচীন শাস্ত্রের যতই আলোচনা হইতেছে, এ্যানি বেসাণ্ট বা স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মহাত্মাগণের নিকট যে আলোক আসিতেছে, দেশপ্রেম যেরূপ জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে "হিন্দুধর্ম্মের পরিণতি" বলিলে ইতিহাস বা সত্যের অপলাপ করা হয় না। দেশাত্মবোধের দিক দিয়া এবং সত্যের দিক দিয়া আমরা সীতানাথ বাবুর কথা সমর্থন করি। "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" শুনিতে বেশ মিষ্ট। কিন্তু উহার সাধনের পন্থা এদেশে উপনিষদের ও বেদান্তের ভিতর দিয়া চলিতে বাধ্য। কোন দেশের কোন জাতির কোন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করিবার সহিষ্ণুতা পরিহার করিয়া 'সার্ব্বভৌমিক' 'সার্ব্বভৌমিক' বলিয়া শূন্যগর্ভ ঘোষণায় সার্ব্বভৌমিকত্ব বজায় থাকে না—সত্যমাত্রই সার্ব্বভৌমিক; কিন্তু ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত জীবনে ঐ সত্যের উপলব্ধি নিজেদের জ্ঞানে এবং উহার প্রকাশ ও প্রচার নিজের দেশের সমুচ্চ সত্য শাস্ত্র ধরিয়া ইহা মনে রাখিতে হইবে। বিলাতে একেশ্বরবাদীগণের একেশ্বরবাদ জাতীয় আকারে বাইবেলের ভিতর দিয়া স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহারা বাইবেলকে ছাঁটিয়া ফেলেন নাই। দেশের অতীতকে ও শাস্ত্রকে সত্য গৌরব প্রদান করিতে কৃপণতা করিলে চলিবে কেন? 'জাতীয় হৃদয়' (sentiment) বলিয়া একটা জিনিষ আছে; তাহা মানবের স্বাভাবিক—উহাকে একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

নশ্বরতা।

(৺জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর)

ফুরাইল আমাদের আমোদ-প্রমোদ।
পূর্ব্বেই তো বলেছিনু, আমাদের এই
অভিনেতাগণ সবে আত্মা অশরীরী;
বাতাসে মিলালো ওরা সূক্ষ্ম আকাশে।
এই মায়া-দৃশ্যটীর গঠন যেরূপ
ভিত্তিহীন সেইরূপ এই সব যত—
অভ্রভেদী চূড়া আর জঁাকালো প্রাসাদ,
অবস্ত—নশ্বর এই প্রপঞ্চেরি মত
সকলি বিলীন হবে; খড়-কুটাটুকু
রাখিয়া না যাইবেক ফেলিয়া পশ্চাতে। *

'সেক্সপীয়র' হইতে অনুদিত।

* পূজ্যপাদ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই অপ্রকাশিত রচনাটি আমরা শ্রীযুক্ত লালবিহারী বড়াল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। —তং সং

"Our revels now are ended: These are actors
As I foretold you were all spirits and
Are melted into air, into thinr air;
And like the baseless fabric of this vision
The cloud-capped towers the gorgeous palaces
The solemn temples, the great globe itself
Yea all which it inherits shall dissolve
And like this unsubstantial pageant faded
Leave not a rack behind."

—Shakespeare.

সংবাদ।

পারিতোষিক-বিতরণোৎসব—গত ২৮শে ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ২৬নং রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটের "সরস্বতী-বালিকা-বিদ্যালয়ের" তৃতীয়বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উৎসব-দিনে সভাস্থলটী যথারীতি সুসজ্জিত হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে বালিকাবৃন্দ কর্ত্তৃক একটী "আহ্বানসঙ্গীত" গীত হইবার পর বিদ্যালয়ের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটীর উপরে ভগবানের স্নেহাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন; তিনি এই বলিয়া তাঁহার প্রার্থনার উপসংহার করেন—"যে জগজ্জননী আমাদিগকে এই শুভ অনুষ্ঠানকার্য্যে আনিয়াছেন; যে বিশ্বপিতা অখিলমাতা সকল জীবের মধ্যে সকল মানবের মুখশ্রীতে স্বীয় মাতৃমূর্ত্তি প্রকাশিত রাখিয়াছেন; যাঁহার মাতৃভাব আজ এইখানে উপস্থিত বালিকাবৃন্দের মুখে স্বপ্রকাশরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; তিনি আমাদের এই শুভ অনুষ্ঠানের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।" অতঃপর বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অনন্তর যথারীতি বালিকাবৃন্দের আবৃত্তি ও পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে শ্রদ্ধেয়া সভানেত্রী মহাশয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে একটী জাতীয় সঙ্গীত গীত হইয়া উৎসব সুসমাপ্ত হয়।

সংস্কৃত-পদ্য-গোষ্ঠী—সংস্কৃত ভাষা প্রধানতঃ গদ্য-পদ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও ইহাতে গদ্য অপেক্ষা পদ্য-সাহিত্যেরই প্রসার অধিক দেখা যায়। এইজন্য কেবল কাব্য বলিয়া নহে—নীতি, ধর্ম্ম, ব্যবহার প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিরও অধিকাংশই পদ্যে গ্রথিত। যে যুগে 'ছাপাখানার' উদ্ভব হয় নাই, সে যুগের পক্ষে সহজে আয়ত্তযোগ্য বলিয়া সর্ব্বত্র পদ্যের প্রভাব হয় তো স্বাভাবিক হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে আর সে দিন নাই। এখন রচনা যাহাতে সহজে আয়ত্তযোগ্য অপেক্ষা সহজবোধ্য হয়, প্রধানত সেই দিকেই রচয়িতাদিগের দৃষ্টি থাকে অধিক; কাজেই সংস্কৃত-সাহিত্যেও অধুনা পদ্য অপেক্ষা গদ্য রচনারই দিন দিন প্রসার ঘটিতেছে। কিন্তু প্রয়োজনের বশে একদিন যে শক্তি পণ্ডিতসমাজের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া উন্নতির শেষ-সীমা লাভ করিয়াছিল, আজ অনুশীলনের অভাবে তাহাকে একেবারে হতশ্রী ও ম্লান হইতে দেখিলে পূর্ব্বার্জ্জিত সম্পত্তি অবহেলায় হারাইতে বসার বেদনায় চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক সুখের বিষয়, সম্প্রতি 'সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের' সুযোগ্য অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদকতায় ৬।১১ চৌধুরী লেনে একটী "সংস্কৃত পদ্য-গোষ্ঠীর" প্রতিষ্ঠা হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। খ্যাতনামা অনেকগুলি অধ্যাপক-পণ্ডিতের সহিত এই পদ্য-গোষ্ঠীর যোগ আছে জানিয়া আমরা ইহার সাফল্য আশা করিতেছি।

'শান্তিধামে' মহাত্মা রাজার সাম্বৎসরিক—এবারে রাঁচিতে পূজ্যপাদ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মোরাবাদী পাহাড়ের' ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সাম্বৎসরিক স্মৃতি-পূজা উৎসবের বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে গত ১০ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) শনিবার 'শান্তিধামের' পর্ব্বতোপরিস্থ ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মার আত্মার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা হয়। তৎপরদিবস ১১ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) শান্তিধামের 'কুসুমতলায়' রাজার জীবনী-বর্ণন, গুণকীর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় রবিবারের সুদীর্ঘ মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হয়; অতঃপর সন্ধ্যায় পর্ব্বতোপরিস্থ ব্রহ্মমন্দিরে যথারীতি কীর্ত্তন, উপাসনা ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। এবারে এই আয়োজনের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী, বয়োবৃদ্ধ প্রচারক বর্ত্তমানে শান্তিধামের ব্রহ্মমন্দিরের ভারপ্রাপ্ত আচার্য্য শ্রীকেদারনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহ ও উদ্যম প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রাতে ৭টার পরে উপাসনা, অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৬ ছয়টার পরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৮৮ সংখ্যা ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭ সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭১। অঞ্জলি—প্রাতর্দেবতা দেবতা।

১। হে প্রভাতের দেবতা! আমরা আজ বহুকাল যাবৎ অনশনে কাল যাপন করিতেছি। আমরা অন্নবস্ত্রের অভাবে দেহে ও মনে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। আজ এই নূতন প্রভাতে আমাদিগের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দাও। আজ এই প্রথম প্রভাত আমাদের অন্তরে হর্ষ উৎপাদন করিয়া প্রকাশিত হউক। আমরা তোমার কৃপার ভিখারী। তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর।

২। এই বিশ্বজগত তোমারই সংসার। গো অশ্ব প্রভৃতি জীবজন্তু সমস্তই তোমারই সংসারের অন্তর্ভূত। বিশ্বজগতে যত কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, সে সমস্তও তোমারই। আমরা তোমারই সন্তান। আমাদিগকে তোমার এই বিশাল বিশ্বজগতে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান দাও এবং যাহাতে তোমার সন্তানের উপযুক্ত বেশে ও সম্মানে জগতের মহাসভায় বাহির হইতে পারি, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ ঐশ্বর্য্য ও গো-অশ্ব প্রভৃতি পশু প্রদান কর। আমাদিগকে দূরে বিতাড়িত করিও না। আমাদিগের মস্তকে তুমি তোমার সন্তাপহর স্নেহ বর্ষণ কর।

৩। সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে যখন কুজ্ঝটিকার ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া তেজঃপুঞ্জ কনকতপন প্রকাশিত হইল, তাহারও মধ্যে তোমারই তেজোময় মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, আজিকার প্রথম প্রভাতে যে কনকতপন আমাদের নয়নের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে, তাহারও মধ্যে তোমারই তেজোময় বিকাশ জাজ্বল্যমান। মাতার ন্যায় তুমিই তোমার স্নেহহস্তের কোমল স্পর্শে আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছ। তোমার চরণবন্দনা করিয়া আমরা নূতন উৎসাহে নবতর শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি।

৪। তোমার জ্ঞানজ্যোতির স্পর্শে আমাদের অন্তরে কি আশ্চর্য্য জ্ঞানস্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছ। আজ এই নূতন প্রভাতে আমরা তোমার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের সন্ধানে দিকে দিকে বাহির হইয়া পড়িতেছি। তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হও।

৫। তুমি আনন্দস্বরূপ। আজ এই প্রভাতে অরুণাচল হইতে কনকতপনের উদয়ে, জীবজন্তুগণের জাগরণকোলাহলে, বিহগগণের সুমিষ্ট কলকূজনে এবং বিমল গগনের সুবিমল হাসিতে তোমার সেই আনন্দের ছায়ামাত্র প্রকাশ পাইতেছে। তোমার আনন্দনিশ্বাসে আমাদের অন্তর হইতে সমস্ত মলিনতা সমস্ত নিরানন্দ উড়িয়া যাক।

৬। তুমি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক। তোমার মঙ্গলবিধানে প্রতিদিন প্রভাতে আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।

তোমারই মঙ্গল ইচ্ছাতে প্রতিদিন নবোদ্যম, নবোৎসাহ আসিয়া আমাদিগকে বিভিন্ন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। আজ আশীর্ব্বাদভিখারী হইয়া তোমার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সমস্ত শুভকর্ম্মে বিজয়লাভের আশীর্ব্বাদ দাও। আমাদের সকল কর্ম্মে সকল অনুষ্ঠানে তুমি আমাদের পার্শ্বচররূপে, সখা ও সুহৃৎরূপে অবস্থান করিও। তুমি যেমন প্রতিদিন প্রভাতে পশুপক্ষীর আহারের সংস্থান করিয়া দাও, সেইরূপ প্রতিদিন প্রভাতে আমাদেরও অন্নজলের সংস্থান করিয়া দিতে ভুলিও না।

৭। এই সুবিস্তীর্ণ আকাশ তোমার গৃহের মহাপ্রাঙ্গন। আজি এই উষাকালে তোমার পুত্র-কন্যা আমরা তোমার চরণপূজা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি, তুমি তোমার অরুণতপনের রথে আরোহণ করিয়া শীঘ্র এখানে উপস্থিত হও। আমরা তোমার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া জীবন সার্থক করি।

৮। এই জগতের প্রান্তে কোটী কোটী মানব অন্তরে তোমার স্বপ্রকাশ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য কায়মনে প্রার্থনা করিতেছে। তুমি কৃপা কর। তুমি তোমার স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে তাহাদের প্রার্থনা সফল কর। তাহাদের জ্ঞানজ্যোতি সমুজ্জ্বল কর। তাহাদের অন্তরস্থ রিপুসকল বিনষ্ট হউক। তাহারা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া পরিপুষ্ট হউক।

৯। হে পবিত্রস্বরূপ! তোমার বিশুভ্র জ্যোতিতে প্রভাতগগন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠুক। আমরা যেন প্রতিদিন প্রভাতে তোমাকে নমস্কার করিয়া মঙ্গলকর্ম্মে নিযুক্ত হই। আমাদের চারি-দিকে অজ্ঞান মোহের অন্ধকার পরিবেষ্টন করিয়া আছে। তুমি সেই অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দাও। আমাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য সুনির্ম্মল মূর্ত্তিতে সমুদিত হউক।

১০। তুমিই একমাত্র চেতনের চেতয়িতা। তোমার ইচ্ছার কণামাত্র লাভ করিয়া সমস্ত প্রাণী প্রাণবান হইয়াছে। তোমারই ইচ্ছাতে সমস্ত প্রাণী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিজ নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়া প্রয়োজনীয় কর্ম্মসকল নিয়ত সাধন করিতেছে। তুমি জ্যোতির জ্যোতি। তোমার প্রকাশে যেমন বহির্জ্জগতের অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, তোমার প্রকাশে তেমনি আমাদের অন্তরেরও অন্ধকার বিদূরিত হয়। প্রভাততপনের অরুণ কিরণের ভিতর দিয়া তোমারই প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখা যায়। সান্ধ্যতপনের অস্তমিত মহিমার ভিতরেও তোমারই শান্তভাব প্রকাশ পায়। হে ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ! আমরা তোমার সন্তান। তুমি আমাদিগকে ধনরত্নে সমৃদ্ধ কর।

১১। তোমার আদেশে আমরা ধর্ম্মাচরণে এবং ধর্ম্মানুকূল কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দুঃখশোক অমঙ্গল যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে।

১২। তুমি আমাদের মস্তকে তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই বর্ষণ কর, যাহাতে আমরা জ্ঞানে অর্থে ধর্ম্মে কর্ম্মে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিতে পারি এবং যাহাতে আমরা প্রচুর তেজ ও বীর্য্য লাভ করিয়া তোমার আদেশ সম্যক প্রতিপালন করিতে পারি।

১৩। তুমি আমাদের রিপুবিনাশনে সহায় হও। তাহারা আমাদের সকলই হরণ করিয়া লইতেছে। তুমি আমাদিগকে যে বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান প্রদান করিয়াছ, তাহা দ্বারা আমাদের কিসে কল্যাণ হয় তাহা যেন আমরা বুঝিতে পারি। তুমিই আমাদের একমাত্র বরণীয়। তুমিই আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া আমাদের জীবন সার্থক কর।

১৪। ভারতের ঋষিমুনিগণ এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকল কর্ম্মে তোমাকে সহায় পাইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত আমরাও তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের সকল শুভকর্ম্মে সিদ্ধি প্রদান করিয়া আমাদিগকে তোমারই পথে অগ্রসর কর।

১৫। তোমার বিমল জ্যোতিতে সমুদয় গগন-প্রাঙ্গন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমা-দের চিত্তক্ষেত্র হইতেও অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। আমাদের অন্তর হইতে হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার পঙ্কিল ভাবসকল পলায়ন করিয়াছে। তুমি আমাদিগকে তোমার সন্তানের উপযুক্ত ধনরত্ন প্রদান কর এবং জগতবাসীগণের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবার শক্তিসামর্থ্য দাও।

১৬। হে মহেশ্বর! তোমার সন্তান হইয়া আমরা আর অভাব দারিদ্র্য সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের গৃহসকল ধনধান্যে পূর্ণ কর; আমাদিগকে রাশি রাশি গো-অশ্ব প্রভৃতি সংসারের হিতকর জীবজন্তু প্রদান কর। শত্রুগণ হইতে আমাদের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা হরণ করিয়া লও। তোমার মঙ্গলবিধানে আমাদের বংশে কখনই যেন অন্নবস্ত্রের অভাব না হয়। আমাদের বংশে দাতা বর্দ্ধিত হউক এবং তোমার প্রসাদে আমাদের বংশের প্রত্যেকেই যেন দানের উপযুক্ত প্রচুর অন্নবস্ত্রের অধিকারী হয়।

৭২। অঞ্জলি—অপার-সুন্দর দেবতা।

১। হে জ্যোতির জ্যোতি! এই শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে তুমি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের আত্মাকে জ্যোতিষ্মান করিয়া তোল। আমাদের আত্মা এখন শান্তসমাহিত হইয়াছে। এই যে পূর্ব্ব গগনে কনকতপনের অরুণ আভা ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে—তাহার ভিতর হে সুন্দর! আমরা তোমারই চরণকমলের আভা দেখিতেছি। আমাদের বক্ষের উপর তোমার ঐ চরণকমল রক্ষিত হউক।

২। হে সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নে ফুটিয়া উঠুক। কনকতপনের অরুণ জ্যোতিতে যেমন তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তোমার সৌন্দর্য্য তেমনি বৃক্ষের প্রতি পত্রে, জীবগণের বলিষ্ঠ দেহের প্রতি অঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে; তোমার সৌন্দর্য্য তেমনি নরনারীর পবিত্র মুখশ্রীতে আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

৩। হে অপাপবিদ্ধ পরমপুরুষ! তুমি আমাদের যখন অন্তরে আসিয়াছ, তখন তোমার জ্যোতিতে আমাদের অন্তরের অন্ধকার বিদূরিত হউক, আমাদের পাপতাপ তোমার পুণ্যতেজে ভস্মীভূত হইয়া যাক।

৪। এই সুবিমল প্রভাতে আমাদের আত্মা তোমার আবির্ভাবের কারণে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মিলিত কণ্ঠে সমস্বরে আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রভাতের সূর্য্য যেমন তালে তালে ছন্দে ছন্দে উদিত হইতেছে, আমাদেরও অন্তরে তেমনি তোমার উদ্দেশে স্তুতিগীত-সকল সুরে-সুরে-সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তুমি আমাদিগকে দারিদ্র্যমুক্ত করিয়া তোমারই সেবায় নিযুক্ত রাখ।

রাজা রামমোহন রায়ের মত ও বিশ্বাস।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, স্বর্গগত ঈশানচন্দ্র বসুর সাহায্যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রণীত যে ইংরাজী গ্রন্থাবলী বাহির করেন, তাহার প্রথম খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠাতে "The Universal Religion" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা স্থান পাইয়াছে। তাহার নিম্নেই লেখা আছে, Religious instructions founded on sacred authorities, Calcutta, 1751 .S. কিন্তু তাহার পরে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে লণ্ডন নগরে যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, তাহার বক্তব্য বিষয় এক হইলেও উক্ত পুস্তিকার নাম একটু স্বতন্ত্র। উহার নাম হইতেছে Translatian of the Creed। রাজার মৃত্যু ১৮৩৩।২৭এ সেপ্টেম্বর ঘটে। আমার নিকট ২য় সংস্করণের ঐ যে পুস্তিকা রহিয়াছে, তাহা রাজার জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ২য় সংস্করণটি যখন প্রথমটির ঠিক অনুরূপ, তখন The Univrsal Religion এ নামটির স্থলে দ্বিতীয় সংস্করণে Creed এ নামটি কেন আসিল?

আমাদের মনে হয় উক্ত পুস্তিকার ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার নাম "The Universal Religion" বা "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" এই নাম রাজা নিজেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ইংলণ্ডে যান, তখন তাঁহার ধর্ম্ম মত ইংরাজগণ জানিতে চাহিলে তিনি Creed নাম দিয়া ঐ পুস্তকই বাহির করেন। তিনি তাঁহার ব্রহ্মসভার মত বলিয়া উহা প্রকাশ করেন নাই। Creed শব্দের অর্থ "ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস"। তিনি কোন নামের বা কোনরূপ সম্প্রদায় গঠনের যে পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা পুস্তিকার নাম দেখিলেই বুঝা যায়। তিনি নাম দিয়াছিলেন, 'প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের অবলম্বিত মত'। উক্ত ২য় সংস্করণের মুখবন্ধেও প্রথম সংস্করণ হইতে সামান্য পার্থক্য আছে। পুস্তিকাখানি প্রশ্নোত্তরছলে অতি সুকৌশলে লিখিত। তিনি তাঁহার মতের পোষকস্বরূপ উপনিষদ হইতে মূল মন্ত্রগুলি উহার শেষাংশে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত

করিলাম না। রাজার গ্রন্থাদি সকলের গৃহে নাই, তাই ইংরাজি অংশের যথাসম্ভব অনুবাদ আমাদের নিজের ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, কি ধীরতা ও জ্ঞানপূর্ণ উদার হৃদয় লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে ৯৬ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। উহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রাজার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর ৪০৭ পৃষ্ঠাতে "অবতরণিকার" "অনুষ্ঠান" নামে প্রকাশিত আছে।

প্রশ্ন। পূজা (worship) কাহাকে বলে?

উত্তর। পূজা শব্দের সাধারণ অর্থ অন্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাহা কিছু করা হয়; কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে হইলে পূজা শব্দের অর্থ, এই সৃষ্টির ভিতরে তাঁহার সত্তা সুগম্ভীর ও ভক্তি ভাবে চিন্তা করা।

২য় প্রঃ। কে পূজা পাইবার যোগ্য?

উঃ। যিনি এই আশ্চর্য্যতম বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রধানতম নিয়ন্তা (শাসনকর্ত্তা) ও রক্ষাকর্ত্তা; যে বিশ্বের প্রতি পরমাণুর সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে।

৩য় প্রঃ। তিনি কে?

উঃ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহাকে নিয়ন্তা ও পালনকর্ত্তা বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; শাস্ত্র ও যুক্তি তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দিয়া উঠিতে পারে না।

৪র্থ প্রঃ। তাঁহাকে কি নির্দ্দেশ করা যায় না?

উঃ। জ্ঞান ও বাক্য তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে না। এই জগৎ পরিদৃশ্যমান হইলেও কেহ ইহার আকার ও ব্যাপ্তি স্থির করিতে পারে না। কেমন করিয়া জগতের সেই অদৃশ্য অস্পর্শ নিয়ন্তাকে আমরা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিব?

৫ম প্রঃ। কেহ কি এই বিশ্বাস (ধারণা) ও পূজার বিরোধী?

উঃ। না; যখন আমরা এই পরম নিয়ন্তাকে প্রকাশ করিতে না পারিয়াও তাঁহাতে বিশ্বাস রাখি ও তাঁহার পূজা করি, তখন অন্য যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই মতের বিরোধী হইতে পারেন না; কেন না, সকলেই স্বীকার করে যে, যিনি তাহাদের পূজার বস্তু, তিনি এই জগতের শাসনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। যাহারা আবার দেশ, কাল ও স্বভাব বা অন্য কোন শক্তিকে এই জগতের শাস্তা বলিয়া মনে করে, তাহারাও আমাদের ধারণাকে ও পূজাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

৬ষ্ঠ প্রঃ। শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে এই পরম পুরুষকে অচিন্ত্য ও বর্ণনাতীত বলা হইয়াছে, এবং অন্যত্র বলা হইয়াছে, তিনি আমাদের জ্ঞানের অধিগম্য। ইহার মীমাংসা কি?

উঃ। যেখানে তাঁহাকে অচিন্ত্য ও বর্ণনাতীত বলা হইয়াছে, সেখানে অর্থ এই, তাঁহার স্বরূপ আয়ত্ত করা যায় না, এবং যেখানে বলা হইয়াছে যে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে, সেখানে তাঁহার অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন। জগতের এই যে রচনা-শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম, পরিষ্কাররূপে তাঁহার অস্তিত্বের সপ্রমাণ করে, ঠিক সেই ভাবে, যেমন নিয়মযুক্ত ও ইচ্ছাকৃত আমাদের কার্য্যাবলী, দেহের নিয়ন্তা আত্মার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, যদিও সে আত্মা শরীরের নিয়ন্তা ও সে আত্মা দেহের সকল অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, যাহার আকৃতি ও সাদৃশ্য আমরা জানি না।

৭ম প্রঃ। তুমি কি অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী?

উঃ। নিশ্চয়ই নহি, কেন না যিনি যে কোন বস্তু-বিশেষের উপাসনা করেন, তিনি মনে করেন, সেই বস্তুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অনাদিকাল হইতে তিনি পালনকর্ত্তা; অথবা সেই আরাধ্য বস্তুই তাঁহার প্রতীক। প্রকারান্তরে তিনিও আমাদের মতের অনুবর্ত্তী।

৮ম প্রঃ। যদি তুমি সেই সর্ব্বস্রষ্টার উপাসনা কর এবং অন্যে অপর ভাবে তাঁহার আরাধনা করে, তাহা হইলে তোমার সহিত তাঁহার পার্থক্য কি?

উঃ। দুই ভাবে আমরা পৃথক। তাঁহারা তাঁহাকে পূজা করেন, তাঁহাকে মূর্ত্তি দিয়া ও তাঁহাকে বিশেষ স্থানে স্থাপনা করিয়া; কিন্তু আমরা বলি, যিনি জগতের পালয়িতা তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের পূজার যোগ্য। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আকার বা রূপ দিই না। দ্বিতীয়তঃ যাহারা বিশেষ ভাবে বা কোন নির্দ্দিষ্ট মতে উপাসনা করে, তাহাদের সঙ্গে যাহারা অন্য ভাবে পূজা করে, তাহাদের পার্থক্য আছে। কিন্তু আমরা কোন মতের বা বিশ্বাসের বিরোধী নহি। আমরা ৭ম প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিয়াছি।

৯ম প্রঃ। তবে তুমি কি ভাবে উপাসনা করিতে বল?

উঃ। ইহা স্মরণে রাখা চাই, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও জগতের সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি তাঁহার এই অপরূপ বিশ্বের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছেন ও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। অধ্যবসায় সহকারে তোমার ইন্দ্রিয়কে ও চিত্তকে সংযত করিতে হইবে। তোমার ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে ও রিপুগণকে সংযত করিবে এমন ভাবে, যাহাতে নিজের বা অন্যের অনিষ্ট না হয়। কেন না যাহা তোমার নিজের পক্ষে অনিষ্টকর অপরের পক্ষেও তাহা পরিবর্জ্জনীয়।

আরও চিন্তা করিবে—জল, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য এবং



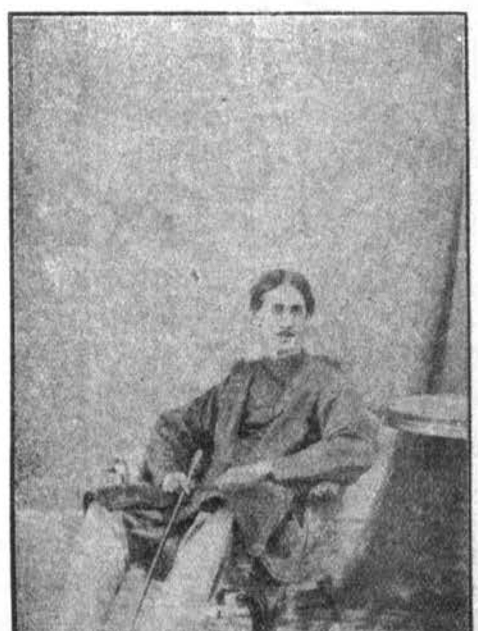
৺গুণেন্দ্র নাথ ঠাকুর



৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর



জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ও রবিন্দ্র নাথ



৺জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর
(প্রথম যৌবনে)

(শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের সৌজন্যে)

ধরাতলে বিবিধ বস্তু হইতে তুমি যে উপকার প্রাপ্ত হইতেছ, তাহা ঈশ্বর দ্বারা ও তাঁহা হইতে হইতেছে। ঈশ্বরই সত্যস্বরূপ। সেই ঈশ্বরকে লাভ করাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়।

১০ম প্রঃ। এই ধর্ম্মবিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতি অনুসারে খাদ্যে, অনুষ্ঠানে ও গার্হস্থ্য ব্যাপারে কোন্ নিয়ম অবলম্বনীয়?

উঃ। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে জীবনের কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত। যিনি শাস্ত্রকে অমান্য করেন, এবং নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলা হয়; শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের নিকট তিনি নিন্দনীয়। শাস্ত্রে এইরূপ স্বেচ্ছাচারের নিষেধ আছে। যুক্তি দ্বারা আলোচনা কর। মনে কর, যদি প্রতি ব্যক্তি বিধি ছাড়িয়া নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তবে সমাজ সত্বরই বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বেচ্ছাচারী লোকের নিকট কার্য্য ও অকার্য্য, সৎ ইচ্ছা বা অসৎ ইচ্ছা—সবই সমান, যতক্ষণ সে নিজের উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিবে; সে কোন নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় না, তাহার ইচ্ছাই তাহার চালক। কিন্তু তাহার নিজের ইচ্ছা অপরের ইচ্ছার বিরোধী হইতে পারে। ইহা হইতে বিবাদ ও কলহ অনিবার্য্য।

১১শ প্রঃ। পূজা করিবার জন্য কোন বিশেষ স্থান, দেশ ও সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যকীয় কি না?

উঃ। উপযুক্ত স্থান অবশ্যই গ্রহণীয়, কিন্তু একেবারেই আবশ্যকীয় নহে। অর্থাৎ যে কোন স্থানে বা দেশে বা সময়ে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থান, সেই দেশ, সেই সময় পূজা বা উপাসনার জন্য প্রশস্ত।

১২শ প্রঃ। কাহাকে এই ধর্ম্মমত ও পূজা (আরাধনা) শিক্ষা দিবে?

উঃ। সকলকেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু চিত্তের উন্নতি অনুযায়ী ইহার শুভ ফল অনুপাত অনুসারে নির্ভর করে।

উপসংহারে আমাদের নিজের বক্তব্য এই, আমরা ত কালস্রোতে অগ্রসর হইয়া চলিতেছি; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শের কোন কোন অংশ আমরা আলোচনা অভাবে ভুলিয়া যাইতেছি। তাঁহার মত ভবিষ্যৎদর্শী পথপ্রদর্শকের ইঙ্গিতের দিকে লক্ষ্য রাখিবার যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীতে "অনুষ্ঠান" প্রবন্ধে যাহা আছে, তদপেক্ষা ইংরাজি সংস্করণ সংক্ষিপ্ত।

গান।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

ইমনকল্যাণ—একতালা।

(আমার) সবার চেয়ে আপন যিনি তাঁরেই আমি আছি ভুলে,
অকূলে ভাসছিলাম আমি—তিনিই তো এনেছেন কূলে।
তাঁরে আমি চিনব যবে সেদিন আমার সুদিন হবে,
উছল হবে হরষ-নদী—ভরবে জীবন ফলে-ফুলে।
তিনি আমার প্রাণের সখা তাঁরেই আমি পাইনি দেখা,
এ দুখ আমি রাখব কোথা কারেই বা তা বলব খুলে।
পাগল হয়ে মোহের বশে এলাম ঘুরে দেশ-বিদেশে,
তবু মোর ভাঙলনা ঘুম—নেশার ঘোরে মরছি ঢুলে।
জানি হে নাথ! নিশীথকালে শ্রান্ত তনু পড়লে ঢলে—
অসহায়ের সহায় তুমি, স্নেহ-কোলে নেবেই তুলে॥

সামাজিক জীবন।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল এম-এ)

সমাজ একটা জীবন্ত জাগ্রত বস্তু। ইহা মানুষের ইচ্ছায় গড়ে ওঠেনি, এবং মানুষ ইচ্ছা করলেও ইহাকে একেবারে নষ্ট করে দিতে পারে না। আমি যদি মনে করি, কতকগুলি লোককে একত্র করে একটা সমাজ গড়ে তুলতে পারব না; কিম্বা কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজকে আমি একা ভেঙ্গে দিতেও পারি না। কোন আকস্মিক ঘটনা সমাজপ্রতিষ্ঠার কারণ নয়। নানা শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজের উৎপত্তি ও জীবন। কখন্ কোথায় কি ভাবে প্রথম সমাজের উৎপত্তি হয়েছিল, তাহা আমাদের জানা নাই। এই বিষয়ে নানারকমের গবেষণা ও কল্পনা চলিতেছে। মানবের আদি সমাজের প্রধান কাজ ছিল আত্মরক্ষা। মানুষ আপনার আহারসংস্থানের জন্য যখন বনে বনে ঘুরে বেড়াত, তখন তাহাকে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার আয়োজন করতে হত। সেইজন্য তারা দলবদ্ধ হয়ে আহার যোগাড় করত, দলবদ্ধ হয়ে একত্র বাস করত। সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হয়েও মানুষ দেখল যে, দলবদ্ধ হ'য়ে থাকাই তার জীবনের পক্ষে দরকার। অন্নসংস্থান, বাসস্থানরক্ষা, দেশজয়—সব কাজে দলের আবশ্যকতা। দল না থাকলে কে কোথায় হিংস্রজন্তুর দ্বারা

আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হোত। যেখানে এখনও মানুষে ভাল করে দল বাঁধতে পারেনি সেখানে সে বড়ই অসহায়।

আত্মরক্ষার জন্য দল বেঁধে মানুষ আপনার অনেক শক্তির পরিচয় পেয়েছে, আপনার অনেক আনন্দের সন্ধান পেয়েছে। সে দেখেছে, সমাজ যেমন তার জীবনের প্রকাশের প্রধান স্থান, সমাজও তেমনি তার জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করছে। সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে সে পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসায় বর্দ্ধিত হচ্ছে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ তার জীবনের নানা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌ছে; আবার সে নিজেও অপরকে সাহায্য করে, অপরের সেবা করে, জ্ঞান কর্ম্ম ও প্রেমের দ্বারা সমাজকে পরিপুষ্ট করে তুলছে। এইরূপে সমাজ ও মানুষ উভয় উভয়কে গড়ে তুলছে। সমাজ না থাকলে মানুষের বিকাশ নাই, আবার মানুষ না থাকলেও সমাজ সম্ভব নয়।

আদিম অবস্থায় এইরূপে আত্মরক্ষার জন্য দেশে দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়েছিল। ক্রমে সেই সব দল প্রসার লাভ করে জাতি সংগঠিত হয়েছে। দেশভেদে ও কালভেদে এক-এক জাতি নিজেদের বিশেষত্ব লাভ করেছে। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, এক-একটী জাতি এক-একটী ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখান থেকে ক্রমে নিজেদের অধিকার বাড়াবার চেষ্টা করেছে। ক্রমে তারা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে; আবার প্রাচীন জাতি নূতন শক্তিশালী জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এইরূপ জগতের মধ্যে অনবরত চলছে। জাতির অভ্যুত্থান ও পতনের কাহিনীতে ইতিহাস পূর্ণ। আর্য্যগণ একসময় পৃথিবীময় ছেয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে যে আর্য্য-সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল তাহা এখন মলিন; মিশরের সে গৌরব নাই, ব্যাবিলনের কীর্ত্তি লুপ্ত, গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতা কেবল কাহিনীতে পরিণত। ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় বা ব্যক্তিবিশেষের অপরাধে যে এই সব জাতির উন্নতি বা অবনতি হইয়াছিল, তাহা বলা শক্ত। তবে মানুষের যে ইহার জন্য দায়িত্ব নাই, একথা বলা চলে না। যখন নরনারীর পুণ্য যজ্ঞ চারিদিক প্রধূমিত করে তুলেছিল, যখন মানুষ আপনার গৌরব রক্ষা করবার জন্য আপনার সমস্ত শক্তির সাধনা করেছিল, সমাজের সেই জীবন্ত অবস্থা; সেই সময় সভ্যতা আপনার আলোকে ও সুগন্ধে দশদিক পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। কিন্তু যখন আবার মানুষ আপনার উচ্চ অধিকার ভুলে গিয়ে নীচ স্বার্থ এবং নীচ বাসনার দিকে দৌড়িয়েছে, সে যখন প্রকৃতির উত্তেজনায় মত্ত হয়ে সদসদ্বিবেকহারা হয়েছে, সমাজে অপরাধের ভার বেড়ে গিয়েছে। এই অপরাধ পুঞ্জীভূত হয়ে সমাজের মধ্যে বিরোধ, স্বার্থপরতা, সুখান্বেষণ প্রভৃতি যখন প্রবল হয়ে উঠে, তখন আর পূর্ব্ব পুণ্য অধিক দিন রক্ষা পায় না। এইরূপে কত জাতি উঠেছে, কত জাতি বিনাশ পেয়েছে।

জাতি বিস্তৃত হলে তাতে নানা শাখা-প্রশাখা জন্মায়। লোকের রুচি, জ্ঞান ও সাধনা-ভেদে কর্ম্ম, আচার ও ব্যবহার ভিন্ন হয়ে যায়। জাতির বিপুল বেষ্টনের মধ্যে থেকেও নানা সম্প্রদায় বা দলের সৃষ্টি হয়। জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে চিন্তার স্বাধীনতা ও ভাবের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে সমাজ পুষ্টিলাভ করে। এই বৈচিত্র্যকে সমাজের দুর্ব্বলতার পরিচয় মনে করিলে আমরা মানুষকে পশু করিয়া রাখিতে চাই মনে হয়। স্বাধীন চিন্তার সহিত মানুষ ফুটিয়া উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কাহারো চিন্তা বা ভাব সমাজ একেবারে গ্রহণ না করিতে পারিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, যারা তার অনুরাগী—তার ভাবের ও চিন্তার সঙ্গে যাদের সহানুভূতি আছে—তারা তার সঙ্গে মিলিত হইয়া মণ্ডলী গঠন করে। এই রকম মণ্ডলী জগতে কত গঠিত হইয়াছে। একটী স্বাধীন মণ্ডলীকে তার প্রাচীন জাতির বেষ্টন হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রাচীন জাতির জীবনকে ইহা সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে। ইহার সাধনায় নূতন উৎসাহ ও তেজ দেখিয়া অন্য মণ্ডলীর অবসাদ দূর হইয়া যাইতে পারে, দেশের উন্নতির নানা আয়োজন হইতে পারে। মণ্ডলীর সহিত মণ্ডলীর প্রতিযোগিতায় মানুষের মঙ্গল বৃদ্ধি

পায়, পরস্পরের দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, পরস্পরের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা হয়।

ভারতের বিরাট সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ একটি মণ্ডলী। রামমোহন রায় ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের ধারাকে বেগবতী করিবার জন্য, কর্ম্মের চেষ্টাকে প্রবল করিবার জন্য, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে গভীর করিবার জন্য আপনার জীবনকে নিয়োজিত করিলেন। তাঁর সাধনার সঙ্গে সহানুভূতি আছে, এইরূপ সব লোক মিলে' ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়েছে। এঁদের জীবনের আদর্শ ছিল পৌত্তলিকতা পরিহার করব এবং পরমপুরুষের পূজা করব; তাতে জাতির ব্যবধান থাকবে না, আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি হবে, এবং দেশের মধ্যে এক নূতন প্রেমের সৃষ্টি হয়ে মনুষ্যসমাজকে নূতন করে গড়ে তুলবে। এই আদর্শ ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করছে, কিন্তু বিরাট সমাজকে পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত করা একজন মানুষের বা একটা দলের কাজ নয়; কিন্তু রামমোহনের যে আকাঙ্ক্ষা তাহা অনেকের হৃদয়কে আঘাত করেছে, অনেকের প্রাণে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া গিয়েছে। যে দল রামমোহন রায়ের অনুষ্ঠান আপনাদের জীবনে সাধন করবার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, তাঁদের মধ্যেও মতপার্থক্য হয়েছে; কেহ গিয়েছেন তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবকে সাধন করবার জন্য, কেহ গিয়েছেন তাঁর জ্ঞানের সাধনা করবার জন্য, কেহ গিয়েছেন তাঁর কর্ম্মকে বিস্তৃত করবার জন্য, আবার কেহ তাঁর সর্ব্বতোমুখী ভাবকে ধরবার জন্য চেষ্টা করছেন; এইরূপ মতপার্থক্যের মধ্যে নানা দল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। প্রকৃতিভেদে কোন মানুষের সাত্ত্বিক ভাব প্রবল, কারও রাজসিক, আবার কারও বা তামসিক; সাত্ত্বিক ভাবের লোক উপাসনা, পূজা-অর্চ্চনা, জ্ঞানচর্চ্চা ও লোকসেবা লইয়া থাকিতে ভাল বাসেন। রাজসিক ভাবের লোক নানা কর্ম্মের মধ্যে সমাজকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে চান; আর যাঁরা তমঃপ্রধান তাঁরা চান বাহ্যিক আড়ম্বর, সাজপোষাক, সুখ-বিলাস। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সমস্ত ভাবের লোক আছে। সাত্ত্বিক ভাবকে বাড়িয়ে রাজসিক ও তামসিক ভাব সংযত করাই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ। কোন ভাবের উচ্ছেদ সম্ভব নয়, একেকে দিয়া অপরকে দমন করিতে হয়। যদি সমাজের মধ্যে তামসিক ভাবের প্রাবল্য হয়, তাহলে ভয়ের কারণ, কেননা, তমঃ বিনাশের সূত্র। আমরা যদি কেবল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজি, যদি উচ্চ সাধনকে আমরা তুচ্ছ করে দিই, তাহলে আমরা সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব; যদি কেবল বাহিরের কাজ ও আড়ম্বর খুঁজি তাহলেও ক্রমে আমরা বাহিরের দিকে চলে যাব। বাহির থেকে আমাদের ভিতরের দিকে যেতে হবে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে যাবে না। যে কোন কর্ম্ম করব সে সমস্ত আমাদিগকে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলবে। ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ আমাদিগকে আলোচনা করতে হবে। আমরা এই আদর্শের ভাবে চলছি, না আমাদিগের জীবনকে অন্য চিন্তা পরিচালিত করছে?

ব্রাহ্মসমাজের সাধনা ব্যক্তিবিশেষের সাধনা নয়, ইহা ব্রাহ্মমণ্ডলীভুক্ত সকলের। একজনও যদি সাধনভ্রষ্ট হয়, কিম্বা তাঁর কার্য্যে ও ব্যবহারে ব্রাহ্ম আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে তাতে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ আঘাত পায়। আবার একজনের অপরাধ সমগ্র সমাজের অপরাধ। যদি একজন কেহ সমাজবিরোধী কাজ করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, সমাজের সাধনার ত্রুটি আছে, সমাজের সকল সভ্য পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য তেমন করে করছেন না। সন্তান পিতৃবিরোধী হলে বুঝতে হবে যে পিতার ত্রুটি। সন্তানের শিক্ষায়, সন্তানের প্রতি ব্যবহারে এমন কোন কাজ পিতামাতা করেছেন, যার জন্য সন্তান তার স্বাভাবিক ভক্তি ও ভালবাসা হারিয়েছে, সে পিতার সংসর্গ ছেড়ে অন্য সংসর্গে গিয়েছে, কারণ পিতা তার সমস্ত অভাব পূর্ণ করতে পারেন নি। সমাজ যদি তার মণ্ডলীভুক্ত লোককে প্রাণভরে ভালবাসে, যদি তার সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়, যদি তার অভাব মোচনের জন্য চেষ্টা করে, তাহলে কোন ব্যক্তির সমাজবিরোধী হওয়া স্বাভাবিক নয়। সমাজের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, সমাজের জ্যেষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের দায়িত্ব খুব বেশী।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন অন্যান্য লোকও তাহা তাহা করে; তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মানেন, লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।"

সমাজপরিচালনে সমাজের শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠিন। তাঁদের জীবনের সমুদায় কার্য্য অপরে পর্য্যবেক্ষণ করছে। নিজেদের জীবনকে তাঁরা যে ভাবে পরিচালন করছেন, তা দেখে অপরে চলবে। তাঁরা যদি নিষ্কাম হয়ে কর্ম্ম করেন, অপরের মধ্যে সেই ভাব গিয়া কাজ করিবে, আর তাঁরা যদি স্বার্থের অন্বেষণ করেন, সুখের জন্য ব্যস্ত হন, অপরে সেই ভাবে যাবে এবং ক্রমে সমাজ মলিন হয়ে পড়বে। সামাজিক জীবনের ইহাই রীতি।

ব্রাহ্মসমাজ কি জগতের কাছে মাথা তুলে বলতে পারেন যে, এথানে আমরা আমাদের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য চেষ্টা করছি? আমাদের কার্য্যে এবং ব্যবহারে আমাদের লজ্জা পাবার কিছু নাই? আমাদের দেখে আমাদের বন্ধুরা এবং সন্তানেরা আমাদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবেন? যদি আমাদের অবস্থা আদর্শানুযায়ী না হয়, তাহা হইলে আমাদের এমন কিছু উপায় করিতে হইবে যাহাতে আমরা নিজেদিগকে এবং সমাজকে রক্ষা করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিবিশেষের বা কেবলমাত্র পুরুষের সমাজ নয়। এথানে পুরুষ এবং নারী সমান অধিকারী; সুতরাং সমাজের উন্নতি, এবং সমাজরক্ষার জন্য পুরুষ ও নারী উভয়েই সমানভাবে দায়ী। পরস্পরের সাহচর্য্যে সমাজের জীবন পরিপুষ্ট হয়। আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের সাংসারিক সুথ-দুঃথ, আমাদের জীবনের উত্থান ও পতন—এই সমস্ত বিষয়ে সকলকেই সমানভাবে চিন্তা করিতে হইবে। সকলেই যদি ভাবেন, এ সমাজ আমার সমাজ, ইহারই মধ্যে আমার জীবনের বিকাশ এবং এই সমাজের উন্নতির জন্য প্রত্যেকে যদি আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের নেতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠেরা সমাজের কাছে বিশেষভাবে দায়ী। তাঁদের জীবন দেখে অপরে জীবনকে গঠিত করে; কিন্তু তাঁরা যদি সমাজের সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না পান, তাঁদের কার্য্যে সকলের সহযোগিতার অভাব হয়, তাহলে তাঁদের চেষ্টা তেমন ফলবতী হয় না। যেরূপ নূতন আদর্শের ভাবে সমাজ গঠিত হয়েছে, সেই আদর্শকে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে বর্দ্ধিত করতে হবে।

ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষা বেড়েছে, ব্রাহ্মগণের অর্থ বেড়েছে, ব্রাহ্মগণের রুচি পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আমরা কি আবার পিছিয়ে যাব? আমাদের ধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম জীবনের সকল বিভাগে ফুটে উঠবে, নরনারী সকলের মধ্যে ফুটে উঠবে। সমাজভুক্ত লোককে দেথে অপরে বলবে—এদের সর্ব্বত্র একটা নূতনত্বের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। এরা ধর্ম্মপ্রাণ ও নীতিশীল, এরা কর্ম্মপরায়ণ, সেবারত এবং মনুষ্যসমাজকে এরা নূতন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। তা যদি না করতে পারা যায়, তাহলে আমাদের আলাদা দল গড়বার কোন আবশ্যকতা নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের চিন্তা অনেকের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, অনেকে শিক্ষায় এগিয়ে গেছেন, অনেকে স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন, নীতিতে কেবল ব্রাহ্মরাই সকলের শ্রেষ্ঠ নহেন—কিন্তু এই সব চেষ্টা ব্যক্তিগত ভাবে। ব্রাহ্মসমাজ এই সমস্ত চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে একটা দল গ'ড়ে ভারতের লোকদিগকে এক উন্নতির পথে অগ্রসর করতে চান। ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। মানুষ হিসাবে অনেক ব্রাহ্ম অপর সমস্ত লোকের শ্রেষ্ঠ না হইতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মের সাধনা সামাজিক ভাবে। আমরা দেখেছি, সকলে মিলে কোন চেষ্টা করলে তাহা সহজ হয়; দশজনে মিলে কোন শুভ কার্য্যের সূচনায় কার্য্যের গতি বেড়ে যায়। তাই আজ আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে, সমাজ ছেড়ে আমরা কোন কাজ করতে গেলে চলবে না; এবং আমাদের সমুদায় আয়োজন এই সমাজমুখীন ভাবে করতে হবে। আমাদের সন্তানপালন, আমাদের সংসারধর্ম্ম, আমাদের অর্থোপার্জ্জন—সমস্তের মধ্যে এই উদ্দেশ্য থাকবে যে, আমরা তার দ্বারা সমাজের জীবনকে পরিপুষ্ট করব। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা তিনি যেন পরিপূর্ণ করেন।

———